মিলনান্তক

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৬৬

—সাড়ে চার টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন : কানাই পাল

মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও ক্যাশ প্রেস, ৩৩ বি, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

সাহিত্যরসিক বন্ধুবর শ্রীবিজয়রত্ন সেন শর্মার সহধর্মিণী
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীকে

১

গাড়িটা যখন স্টেশনে এসে পৌঁছাল তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। আকাশে যেন গঙ্গা-যমুনার মিলন ; পশ্চিম দিকটা অন্ধকারই বলা চলে, পূবদিকটা কিন্তু নূতন চাঁদ উঠে পরিষ্কার হয়ে আসছে। কাল পূর্ণিমা গেছে, আজ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ।

মণীশ স্যুটকেসটা হাতে করে কতকটা যেন আচ্ছন্নভাবে নেমে দাঁড়াল। মার্টিনের ছোট গাড়ি, পা-দানির সঙ্গে জমির তফাৎ নেই বললেই হয়, সেদিক দিয়েও কোন প্রয়াস করতে হোল না। গাড়ি হুইসিল দিয়ে চলে গেল।

খুব ছোট স্টেশন ; এগাড়ি-ওগাড়ি থেকে জন পাঁচ-ছয় যা লোক নামল তারা চলে গেল ; মণীশ দাঁড়িয়ে রইল তবু। সেই রকম আচ্ছন্নভাবেই মাথাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে ; সামনে, পাশে, ওপরে, নীচে। বড় অদ্ভুত লাগছে!

অদ্ভুত লাগছে তখন থেকেই যখন ওর গাড়ি বাংলা দেশে প্রথম প্রবেশ করল, আজ দুপুরে ; বিশেষ করে বর্ধমান পেরুবার পর থেকে। ও এল আজ এগারো বৎসর পরে ; এক যুগ। গিয়েছিল ওর বয়স যখন বাইশ।

আরও অদ্ভুত লাগছে নিশ্চয় এইজন্য যে, পরিবর্তনটায় ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হওয়ার অবসর পায়নি। যেন এক নিঃশ্বাসে চলে এসেছে সমস্ত পথটা—মীরাট থেকে এখান পর্যন্ত, শুধু গাড়ির অদল-বদলে যেটুকু সময় গেছে।

কী বিপুল প্রভেদ ! মানুষ থেকে নিয়ে সব কিছুতেই—আকাশ, বাতাস, মাঠ, ঘাট, লতাগুল্ম, বনস্পতি ; তাদের আকার, প্রকৃতি, আকৃতি—সবদিক দিয়েই। কোন্ দেশটা ভালো, কোন্টা মন্দ ঠিক বুঝতে পারছে না, জীবনের মাঝখানের এগারোটা অমূল্য বৎসর যে জায়গায় কাটাল, একটা মোহ-সঞ্চার তো হয়ই মনে

তার জন্য। তবু এটাও ঠিক যে, যতই দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে, যতই সুপ্ত স্মৃতির ওপর পরিচিত দৃশ্যগুলির সোনার কাঠির ছোঁওয়া লাগছে, ততই যেন একটা নূতন মোহের মধ্যে প্রবেশ করছে মণীশ। আস্তে আস্তে ভালো লাগছে এই মানুষ-চলা পথের ওপর দিয়ে এই বিঘৎখানেকের চওড়া রেল লাইন; এই গাড়ির-গায়ে-লুটিয়ে-পড়া বুক-চাপ বন-বাদাড়; তাদের মধ্যে আধেক-দেখা, আধেক-অদেখা বাড়িঘর; কোথাও খিড়কি,*কোথাও সদর দিয়ে যেন গৃহস্থের খোঁজখবর নিতে/নিতে গাড়ির বেরিয়ে আসা।

ভালো লাগছে নিজের জীবনের ফিরে-পাওয়া পরিবেশ ব'লে। আরও ভালো লাগছে, যেখানেই চাইছে, একখানি মুখ উঠছে ফুটে, এগারো বৎসর আগে দেখা একটি পঞ্চদশীর কচি স্নিগ্ধ মুখ। মুখ-খানিতেই দৃষ্টি যাচ্ছে আটকে, তবু এক এক সময় সবটুকু স্পষ্ট হয়ে উঠছে—আলতাপরা পা দুটি থেকে নিয়ে খয়ের রঙের শাড়িতে জড়ানো দেহযষ্টিটুকু।

আশ্চর্য লাগছে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আজকের মতো স্পষ্ট করে আর কোন দিনই মালাকে যেন পায়নি মণীশ। এখান থেকে গিয়ে প্রথম প্রথম ওর স্মৃতিটা নিশ্চয় জড়িয়ে ছিল মনের সঙ্গে, কিন্তু সেই রুক্ষ পরিবেশে কখনই ভালো করে ফোটাতে পারেনি সে-স্মৃতিকে, যতদিন মনে ছিল, তার সঙ্গে মিশে ছিল এই শান্ত, শ্যামল বন-পল্লীখানি। তারপর কর্মস্রোতের মধ্যে কবে যে মিলিয়ে গেল, আর মনে নেই।

তারপর আর এক আশ্চর্য ব্যাপার এই ঘটেছে। কমবেশ করে এগারোটা বছর যাকে একেবারেই ভুলে থাকতে পেরেছিল, সে যখন ফিরে এল, একেবারে একটা দুর্বার স্রোতেই এল ফিরে। একটা কারণ হয়তো হয়েছিল, কিন্তু তাই বা এমন কি?…

অফিসের চাপরাসী পাণ্ডে এসে বললে—"ছুটি চাই।" লোকটা একটু স্ত্রৈণ, ছেলেমেয়েতে পরিবারটিও বড়; প্রায়ই ছুটি চায়।

"আবার ছুটি! এবার তাহলে?…"

বেশ বিরক্তভাবেই প্রশ্ন করলে মণীশ। ছেলেমেয়েদের নাম করে পাণ্ডে। এবার স্ত্রীর কথাই বলল—ভয়ানক অসুখ।

"প্রতিবারেই ভয়ানক থাকে। যাও, হবে না, কাজ চলে না এভাবে!"

"অন্তত একটা দিনের তরেও হুজুর। অফিসের কাজ সেরেই যাব। গিয়ে একটু ব্যবস্থা করে দিয়েই চলে আসব।"

"হবে না, দিক কোর না।"

ওদিকে গিয়ে মেজাজটা ধীরে ধীরে রুক্ষও হয়ে উঠেছিল মণীশের। স্বীকার করত না; আজ এখানে দাঁড়িয়ে নিজের কাছেই স্বীকার করছে।

"শক্ত অসুখ হুজুর। বলে পাঠিয়েছে না গেলে আর দেখা হবে না।"

"তাহলে ইস্তফ দিয়ে একেবারে যাও।"

কাজ ছেড়ে ওর সঙ্গে তর্ক করলে চলে না। মণীশ ঘুরে খোলা খাতায় দস্তখৎ শুরু করে দিল।

ঘণ্টাখানেক; তার বেশী নয়। কিন্তু এই একটি ঘণ্টা যে কী করে কাটাল মণীশই জানে নিজের মনে। ও যে শাপ-মন্যি, তুকতাক এসবে বিশ্বাসী এমন নয়, তবু ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়ে মনটা অদ্ভুত-ভাবে চঞ্চল হয়ে উঠল। ঐ তিনটি মাত্র শব্দ 'দেখা হবে না', অত অল্প, অত সামান্য, কিন্তু ফুলে-ফেঁপে কী একটা বিপুল আকার নিয়ে যে মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল, কোন মতেই ঠেলে রাখা গেল না। দু'বার দস্তখতটা ভুল জায়গায় পড়ে গেল। একবার কলমের মুখে পাণ্ডের নামটাই এল বেরিয়ে। তবু অনেকক্ষণ লড়াই করল দুর্বলতাটুকুর সঙ্গে, কিন্তু দুর্বলতা যে এত প্রবল হতে পারে এই প্রথম টের পেল। ঘণ্টাখানেকও বোধ হয় কাটে নি, কলিংবেল টিপে পাণ্ডেকে ডেকে একটা দিন বেশীই দিয়ে বলল, "দেখো দু'দিনের বেশী যেন না লাগে।"

তবু কিন্তু ফল হোল না। একটু বোধ হয় সাময়িক স্বস্তি,

তারপরেই কথাটা আবার ফিরে এসে সেইভাবে মনটাকে অভিভূত করে ফেলতে লাগল। শঙ্কিতই হয়ে উঠল মণীশ। বিশ্বাস করে না এসবে, তবু একটা সংশয় অনিবার্য হয়ে উঠল—যে রূঢ় আঘাতটা পাণ্ডেকে দিল ওভাবে এটা তারই কোন রহস্য-প্রতিক্রিয়া নাকি? আশঙ্কা হতে লাগল—যদিই না দেখা পায় সে!···কিন্তু মণীশ তো তাকে একরকম বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছে ছুটি; একেবারে চাওয়া মাত্র দিলেও কি যখন গেছে তার আগে পারত যেতে? আর, একদিনের জায়গায় তো দু'দিন দিয়ে দিল।

কার সঙ্গে মনে মনে যেন তর্ক করতে হচ্ছে; বোঝাতে হচ্ছে তাকে। একটা অসহ্য অবস্থা; যদি দেখা না হয়!

উৎকট উদ্বেগ নিয়ে পাণ্ডের ফিরে আসার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

যথাসময়েই ফিরে এল পাণ্ডে। খবর ভালোই। জ্বরটা আরম্ভ হয়েই হঠাৎ চড়চড় করে বেড়ে ওঠে। প্রথমটা বাগ মানতে চায় নি, বৈদ্-মহারাজও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। তারপর আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে; পথ্যও দেওয়া হয়েছে।··সব মিশিয়ে তিনটে দিন।

একটা মস্ত বড় বোঝা নেমে গেল মণীশের বুকের ওপর থেকে। তিন দিনের মধ্যে যার কঠিন ব্যারামের শুরু থেকে পথ্য পাওয়া পর্যন্ত সবটুকু শেষ হয়ে যায় তার সম্বন্ধে এমন কিছু ভাববারও নেই।

ওটা কিন্তু মন থেকে সরল না, যা ঐ একটু সাময়িক স্বস্তি। শুধু একটা প্রভেদ, এবার আর সেই আশঙ্কার ভাবটা নেই; তার জায়গায় একটা অবসন্নতা। কিসের জন্য একটা নৈরাশ্য। ঐ কথাটুকুকে ঘিরে মনটা যেন ক্রমাগতই কান্নার আখর জুড়ে জুড়ে যাচ্ছে—আর দেখা হবে না।

কিন্তু কার সঙ্গে হবে না দেখা? কী তাতে ক্ষতি? জীবনের এত বিচিত্র ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে এই অনির্দিষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনাটুকু হঠাৎ এভাবে কেন চিহ্নিত হয়ে যেতে চায় তার জীবনে? দেখার মতো

অনেকগুলি মুখ মনে পড়ে—এইখানে এসে ভরাযৌবনের দৃষ্টি নিয়ে দেখা—অনেকগুলি ভালো লেগেছিল—তার অনেকগুলি আবার দেখা হওয়ার বাইরে চলে গেছে—কয়েকটি আছেও হয়তো। মনে করে দেখুক না মণীশ।

উঠছে ভেসে ভেসে, কিন্তু কোনটির সামনেই যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না মনটা। কেবলই মনে হচ্ছে অনেক মুখের ভিড়ে একটি মুখ যেন কোথায় আছে লুকিয়ে, তাকে না পেলে যেন ওর খোঁজার আর শেষ নেই। এ রকম একটা অসহায়তা, এ রকম অব্যক্ত অশান্তি আর কখনও কি এসেছিল জীবনে?

তারপর পড়ল মনে।

যখন পড়ল তখন বিস্মিতই করে দিল মণীশকে। কি করে ভুলে ছিল এই দীর্ঘ এগারো বছর ধ'রে? কি ভাবে, কবে তলিয়ে গিয়েছিল মনের অতলে!···যৌবনের একেবারে ও-প্রান্তে দেখা একটি মুখ।

কিন্তু বাংলার পল্লীর একটি গৃহস্থ-কন্যা; এই এগারো বৎসরে কত কী-ই না হয়ে গিয়ে থাকতে পারে তো। প্রথমত, বিবাহ। যা তার জীবনের আর সব সূত্রই ছিন্ন করে দিয়ে তাকে আলাদা করে দিয়েছে। তারপর···তারপর হয়তো সব হওয়ার শেষ হওয়া, মৃত্যু। কে জানে!

কিন্তু হঠাৎ এত উদগ্র হয়ে উঠল মনটা যে কোন যুক্তিই যেন আর দাঁড়াতে পায় না। হয়ে যাক সে অন্যের, তবু মালার সঙ্গে মণীশের সম্বন্ধ নেই এ রকম সৃষ্টিছাড়া কথা—প্রায় হাস্যকর—ভেবে ওঠা যায় না। ওকে যেতে হবে, আগেকার মতোই দেখার সেই পূর্ণ অধিকার নিয়ে। দেখে ক্ষমা চাইতে হবে এই দীর্ঘ বিস্মৃতির জন্য। একটা অপরাধ হয়ে গেছে।

আর মৃত্যুর কথা? এই সম্ভাবনার চিন্তাতেই তো এ রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে মণীশ। পাণ্ডের জীবনের ঐ সামান্য ঘটনাটুকু থেকে উদ্ভব এ চিন্তার। মালার মৃত্যু হয় নি। তবে হতে চলেছে। পাণ্ডের

প্রেয়সীর মতো মালাও তার জন্য অপেক্ষা করছে একেবারে মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে। মণীশের আর দেরি করা চলবে না; আর এক দণ্ডও নয়; তাহলেই কী সর্বনাশ যে হয়ে যাবে জীবনে, সে যে কী শূন্যতা, কল্পনাতেও আনতে পারা যায় না।

ছুটি পাওনা নেই কিন্তু একটি দিনেরও। নির্লিপ্ত জীবন, অফিসে ছুটি সঞ্চয় করে রাখে না মণীশ ভবিষ্যতের জন্য; যার ভবিষ্যৎই নেই তার আবার সঞ্চয়! এই মোটে সেদিন একটা লিফ্‌ট্‌-ও পেল, ছোট-খাট একটা অফিসারের পদে; তার দায়িত্ব···

সবই কিন্তু ফিকে বোধ হচ্ছে। মালাকে দেখতে যেতে হবে—মালা তার পথ চেয়ে আছে—হয়তো শেষ প্রতীক্ষাই—তার সামনে নূতন পদের দায়িত্ব—তার সামনে ছুটি আছে কি নেই তার হিসাব!

তবু এই সব চিন্তাই বাধা দিয়ে একটা দিন আটকে রাখল। এগারো বছরের অমানুষিক দ্বন্দ্ব অদৃষ্টের সঙ্গে; সেও তো একেবারে মুছে ফেলা যায় না মন থেকে।

পরদিন উ´তন অফিসারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ছুটি দিতে হবে। সমস্ত রাত নিদ্রা নেই, তাইতে মনটা রয়েছে আরও চঞ্চল, বোধহয় যথাপদ্ধতি তুলতে পারে নি কথাটা—ছুটি পাওনা নেই, লোকটা সুবিধার নয়—একথাগুলাও তো মনে জাঁকিয়ে বসেছিল। পাণ্ডেকে ছুটি না দেওয়ার তার নিজের যেসব আপত্তি সব গেল ভুলে। পাণ্ডেকে যেভাবে মলিন মুখে, দৃষ্টি নত করে চলে যেতে হয়েছিল, সে কথাও। ব্যাপারটুকু গোড়া থেকেই রূঢ় হয়ে উঠেছিল, ছুটি না পাওয়ায় মুখের ওপরই কাজে ইস্তফা দেওয়ার কথা বলে বেরিয়ে এল।

তারপর অফিসের সবার সহানুভূতি, উপদেশ, পরামর্শ, মৃদু ভৎ´সনা,—যারা ভালো চায় ওর···

ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়িয়ে' আছে একভাবে। তিনটে দিনের যত কথা ভিড় করে আসছে মনে।

"কোথায় যাবেন বাবু? ব্যাগটা দিন না আমায়।"

সম্বিৎ এসে গিয়ে ফিরে চাইল মণীশ। একটি বারো-তেরো বছরের ছোট ছেলে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, "না, ব্যাগ নিয়ে যেতে হবে না। যাব আমি ঐখানে, ঐ যে দোতলা বাড়ি।"

"তবুও দিন না।"—আব্দারের সঙ্গে কথাটুকু বলে একটু ঘেঁষে এল ছেলেটা।

"এইটুকু তো। আর এই ছোট্ট সুটকেস।"—পা বাড়াল মণীশ।

ছেলেটা একটু লজ্জিতভাবে হেসে সুটকেসের হাতলটা ধরল, বলল, "আমার ছুটো পয়সা হবে···যা দেন···"

মণীশ ছেড়ে দিয়ে একটু হেসেই বলল, "বেশ, চল্, এগো তুই।"

২

স্টেশন-সীমানার পরেই জেলা বোর্ডের রাস্তা, রেলের সমান্তরালে দু'ধারে চলে গেছে। রাস্তার ওদিকটা, স্টেশনের দিকে মুখ করে গোটা-চার ছোট ছোট দোকান। তাদের মাঝখান দিয়ে হাত তিনেক চওড়া একটা মেটে রাস্তা এই রাস্তাটা থেকে সোজা বেরিয়ে গেছে। স্টেশন-সীমানার পরেই কয়েক গজের একটা কাঠের বেড়া, একটা ট্রেন এসে দাঁড়ালে লম্বালম্বি প্রায় যতটা জায়গা নেয়। সেটা ঘুরে দুজনে আবার এগিয়ে এসে মেটে রাস্তাটার সামনে পড়ল। ছেলেটা এগুতে যাচ্ছিল, মণীশ পেছন থেকে বলল—"একটু দাঁড়াবি।" নিজে একটু দূরেও পড়ে গেছে এরই মধ্যে।

আসলে যেন পা চলছে না। এতক্ষণ অন্য ঘোরে ছিল, এখন আবার সেই চিন্তাটা এসে জুটেছে—কী দেখবে, কী শুনতে হবে।···

এত কাছে এসে এখন আর ঠিক সে ভাবটা নেই, সেই যে মীরাটে থাকতে মনে হয়েছিল—যেখানে, যে অবস্থাতেই থাকুক না মালা, আগেকার মতো পূর্ণ অধিকারেই করবে দেখা।

হয়তো দেখবে এখানে নেই। শুনবে বিবাহ হয়ে গেছে—সে এখন গৃহকর্ত্রী কিম্বা বড় পরিবারের মধ্যে বধূ—গৃহকর্ত্রী না হলেও কয়েকটি সন্তানের জননী, পরিবারের মধ্যে বিশিষ্টা। সমস্ত চিত্রটি রেখায় রেখায় সুপরিস্ফুট—মীরাটের মতো আর ধোঁয়াটে কিছু নেই তার মধ্যে।···কী করে ভাবতে পেরেছিল এগারো বৎসর পূর্বেকার সেই অধিকারে দাঁড়াবে তার সামনে গিয়ে ?

এসব আজগুবী স্বপ্ন দেখে কি করে মানুষ!

তারপর, যদি মৃত্যুই এসে নিয়ে গিয়ে থাকে! কিম্বা—এ সম্ভাবনার কথা এখানে এসে এখন হঠাৎ মনে হোল—যদি নিজেই ডেকে এনে থাকে মৃত্যুকে !

ছেলেটা একটু চিন্তিত হয়েই ঘুরে দাঁড়াল। ছেলেমানুষ হলেও এটুকু তো দেখতে পাচ্ছে, মানুষটার কেমন যেন ছমছমে ভাব।··· অতক্ষণ এক ঠায় দাঁড়িয়েই ছিল স্টেশনে।

রাস্তার দু'ধারের দোকানের মধ্যে একটা চায়ের। অতি দীন, সামনে বাঁশের খুঁটির ওপর বাঁশের বাতা বিছিয়ে একটা কায়েমী বেঞ্চ। দুজন খদ্দের বসে ছিল, একজন শেষ করে পয়সা দিয়ে চলে গেল।

ঐ অবলম্বনটাই আপাতত ধরল মণীশ, ছেলেটাকে বলল—"মনে করছি এক কাপ চা খেয়ে নিই না হয়।"

"এখানে! বাড়ি তো এসে গেছেন।"—খুবই বিস্মিত হয়ে পড়েছে ছেলেটা।

"সেখানে তো হবেই। করতে ধরতে একটু দেরি হবে তো। অনেক দূর থেকে আসছি—ম্যাজ ম্যাজ করছে শরীরটা।···দাও তো গা; বেশ কড়া ক'রে' এক কাপ। শীগগির।···দু'কাপ। তুইও খেয়ে নে এক কাপ বরং।"

বসল বেঞ্চটায়। ঐ চিন্তাটাই মনকে ঢেকে রেখেছে, সংগতি-অসংগতির কথা ভাববার শক্তি নেই। এখান থেকে নারকেল-সুপারি গাছের ফাঁকে ফাঁকে বাড়িটার একটা ঝাপসা আদল দেখা যায়। একটা রহস্যপুরী যেন, চোখ ফেরানো যায় না। ওখানেই যেতে হবে আর মিনিট কয়েকের মধ্যেই…কোনও অজুহাতে আর একটু দেরি করা যায় না?

পাশের লোকটি অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছে। পাড়াগেঁয়ে বেকার মানুষের অলস প্রশ্ন—"কোথা থেকে আসছেন—কি নাম—কি করা হয় সেখানে—এসেছেন…ও! ললিতের বাড়িতে?…ওঁদের সঙ্গে কি সম্বন্ধ আপনার?…

প্রশ্নের চাপেই সত্যমিথ্যা কিছু কিছু উত্তর দিয়ে উঠে পড়তে হোল। চা'টা বেশ কড়াও করেছে দোকানী ছোকরা; সেই ঝিমুনো ভাব অনেকটা কেটে গেছে তাতে।

দোকান পেছনে রেখে এগিয়ে চলল। এদিকটা বেশ পরিষ্কার; এতক্ষণ গাড়িতে যেমন দেখে এল, মাঠ পেরুলেই ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল, তেমন নয়। তার কারণ সামনেই ডান দিকে একটা বেশ বড় পুকুর। খানিকটা ছেড়ে বাঁয়েও একটা ডোবা। ধারে-কাছে যা গাছপালা তা হয় নারকেল না হয় সুপারি; সুপারিই বেশী।

আশ্বিন মাস। একটা কুয়াশা জমেছে যা এ সময়ের পক্ষে একটু ঘন বলেই মনে হয়। তবে বাংলাদেশের কথা অনেকটা ভুলেও তো গেছে মণীশ; হয়তো এই রকমই হয়ে থাকে। চাঁদটা ইতিমধ্যে আরও উঠেছে আকাশে। প্রায় পূর্ণিমারই জ্যোৎস্না, কিন্তু কুয়াশার ওপর পড়ে ঘষা কাচের মতো অস্বচ্ছ দেখাচ্ছে। তাইতে সমস্ত জায়গাটাই মণীশের কেমন যেন স্বপ্নালু বলে মনে হচ্ছে!…মনটা নিজেও তো স্বপ্নালুই হয়ে রয়েছে এদিকে। কুয়াশা-লিপ্ত দীর্ঘ নারকেল-সুপারির গাছগুলা অবাস্তবতার ভাবটাকে যেন আরও ফুটিয়ে তুলেছে। নীচে দিয়ে এগিয়ে চলেছে দুজনে। এদিকটা আরও পরিচিত।

ঐ যে দূরে বাঁধানো ঘাটটা দেখা যাচ্ছে, ঐখানে প্রথম দেখা হোত মালার সঙ্গে, যখনই মণীশ গাড়ি থেকে নেমে বাড়ি আসত সেসব দিনে। প্রতিবারেই নিশ্চয় নয়, তবে ওর মনে হয় দশবার এলে তার মধ্যে আটবার মালা তো রয়েছেই ঘাটে। সকালের গাড়িতে এলে, হয়তো স্নান করছে; তুপুরে যদি এল, দিদি বৌদিদি কারুর সঙ্গে বাসনের গোছা নিয়ে মাজতে বসেছে; সন্ধ্যায় এলে, গা ধুতে নেমেছে জলে। কিছু না ক'রে একলা বসে থাকতেও দেখেছে চুপটি ক'রে; বিশেষ করে এদিকে একটু বয়স হওয়ার পর। আর, দেখা হলেই ওর প্রথম কাজ ছুটে গিয়ে আগে বাড়িতে খবরটা দেওয়া, একাই থাক বা আর কারুর সঙ্গে। তারপর আবার বেরিয়ে এসে হাসিমুখে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে।

একদিন বলেছিল মালাকে—"এমন অব্যেস করে দিয়েছ মালা যে আসতেই তোমায় পুকুর-ঘাটটিতে আগে না দেখতে পেলে ওখান থেকেই কেমন যেন মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে থাকে।"

শেষদিকের একদিনের কথা; মালা তখন বড় হয়েছে, উত্তর দিতে শিখেছে। মুখের ওপর হাসি-হাসি চোখ তুলে বলল—"তুমি এসো তো তাড়াতাড়ি, থাকবে না আর খুঁৎখুঁতুনি।"

মণীশ বলেছিল—"তাহলে তো রোজ চোপোর দিন তোমায় বসে থাকতে হয় ঘাটে; রাত পর্যন্ত।"

চোখ তুটি একটু নাচিয়ে উত্তর দিয়েছিল—"থাকি না যেন!"

—অর্থাৎ সবই যার রইল ঘাটে পড়ে, তার আর বাকি রইল কি?...হাসিভরা চঞ্চল চোখ, আর বলতে শিখে সেই নূতন কথাগুলি বড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মনে।

রাস্তাটা সোজা পুকুরটার বাঁ কিনারা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এইটাই বাড়িটাতে যাওয়ার রাস্তা, ওখানে গিয়ে একটু ঘুরে গ্রামের দিকে চলে গেছে। বাড়িটা গ্রাম থেকে একটু বিচ্ছিন্ন।

পুকুরের কাছাকাছি এসে ছেলেটা কিন্তু এ রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে

বাঁ দিকে আর একটা যে সরু ফিকড়ি বেরিয়ে ডোবাটা ঘুরে চলে গেছে সেইটেতে ঢুকে পড়ল।

মণীশ টুকল—"আমি ঐ সামনের দোতলা বাড়িটায় যাব বললুম যে!"

"তাই যাচ্ছি, আসুন না।"

"তা ও ঘুর-পথে কেন?" দাঁড়িয়ে পড়েছে মণীশ।

ছেলেটাও ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়াল, একটু যেন জিদের সঙ্গে বলল—"আসুন না আপনি।"

মণীশ পা বাড়িয়েই আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এই পথে সেই প্রত্যাশার কথা। মালা থাকবে প্রতীক্ষা করে। কিন্তু প্রায় রাতই হয়ে গেছে, আর মাঝখানে এই এগারোটা বৎসর। তবু···যদি ছটাকখানেক সম্ভাবনাও থাকে—কোন রকমে···

দাঁড়িয়ে থেকেই বলল—"মিছে ঘুরতে যাব কেন? পথটাও তো জঙ্গুলে বলে মনে হচ্ছে।"

"রেতের বেলায় ও পথে কেউ যায় না।"

"তার মানে?"

তারপর নিজেই প্রশ্ন করল—"পুকুরের পাড় ভেঙে গেছে?"

"তাই। আপনি আসুন তো। দাঁইড়ে থাকে না।"

সেটাও কি রকম ঠেকল; মণীশ আর কিছু না বলে এগিয়ে গেল। খানিকটা ভেতরের দিকে গিয়ে ছেলেটা প্রশ্ন করল—"আপনি বামুন?"

মণীশ উত্তর করল—"হ্যাঁ, কেন বল্ তো?"

"তাহলে অবিশ্যি গেলে কিছু হোত না।"

রেগে গেল মণীশ, বলল—"তুই বেটা ভূতের ভয়ে আমায় ঘোরালি এ রকম ক'রে? আচ্ছা তো! কতটা দূর হবে এ পথে?"

"দূর কোথায়? ডোবাটুকু ঘুরেই ঐ বাগানের পাশ দিয়ে এসে পড়ব।"

"দেখো তো কাণ্ড!"

এগিয়ে চলল দুজনে।

এদিকটা কেবলই সুপারি গাছ। তলা দিয়ে রাস্তাটা কোথাও বাঁয়ে কোথাও ডাইনে ঘুরে এগিয়ে গেছে। দীর্ঘ ঋজু গাছগুলার মাথা কুয়াশায় মিলিয়ে মিলিয়ে গেছে। মীরাট থেকে এখানকার স্টেশন পর্যন্ত যে একটা বিচিত্র কোলাহলের মধ্যে দিয়ে একটানা চলে এল, সেটা হঠাৎ থেমে গিয়ে স্তব্ধতাটা আরও নিবিড় বোধ হচ্ছে। এক-একবার মাঝখানের সব মুছে গিয়ে মনে হচ্ছে মীরাট থেকে বেরিয়েই ও যেন এইখানে এসে নামল।

মনটাকে কোন কিছুতেই আটকে রাখা যাচ্ছে না। ও নিজে না চাইলেও—নিজের কাছে বৃথা মনে হলেও—এক-একবার আপনা হতেই ঘাড়টা ঘুরে যাচ্ছে, নজরটা গিয়ে পড়ছে পুকুরের সেই ঘাটটার ওপর, দূরে পড়ে গিয়ে খুবই ঝাপসা এখন।

তারপর হঠাৎ একবার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। এবার ঘাড়ও ফেরায়নি; রাস্তা চলতেই ডাইনে যে একটু বেশি ঘুরতে হোল তাইতেই সুপারি গাছের মধ্যে দিয়ে নজরে পড়ে গেল একটি স্ত্রীলোক স্নান করে উঠে ঘাটের রানায় দাঁড়িয়ে কাপড় নিংড়াচ্ছে। খানিকটা অস্পষ্ট হলেও আর সন্দেহের কিছু নেই, শাদা ভিজে শাড়ি, দুটি হাতের সঞ্চালনে শরীরটায় একটু একটু দোল—সব বেশ নজরে পড়ে।

নিজে হতেই দাঁড়িয়ে পড়েছে মণীশ।

ছেলেটা এগিয়েই গিয়েছিল, বোধ হয় পেছনে পায়ের শব্দ না পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

"দাঁইড়ে পড়লেন যে?"—প্রশ্নটা করেই পা চালিয়ে ফিরে এসে একটু গা ঘেঁষেই দাঁড়াল ওর মুখের ওপর মুখ তুলে। ভয় পেয়ে গেছে।

অতিরিক্ত চঞ্চল হয়ে পড়েছে মণীশ। ওর প্রশ্নে মুখটা এদিকে ঘুরিয়েছিল, আবার ঘাটের দিকে চেয়ে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে বলল—"বলছিলুম ঐদিক দিয়েই চল্; এ পথটা যেন কি রকম।"

ছেলেটার দৃষ্টি এমন ভয়ার্ত হয়ে উঠেছে, যেন মনে করেছে গাড়ি থেকে ভূতই নেমে আজ তার সঙ্গ নিল। মরীয়া হয়েই কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় স্টেশনের দিক থেকেই চায়ের দোকানের সেই প্রৌঢ় লোকটি এসে উপস্থিত হোল। একটু বিস্মিত ভাবে দেখে নিয়ে ছেলেটিকেই প্রশ্ন করল—"তোরা এখানে দাঁড়িয়ে যে?"

ছেলেটা সাহস পেয়ে একটু অনুযোগের স্বরেই বলল—"দেখুন না দয়াল মামা, উনি ললিতবাবুর বাড়ি যাবেন, তা··"

"তা এতটা ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস কেন?"

মণীশ বলল—"বলে, ও পথে ভূত।"

"ভূতের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, সন্দে রাতে লোকের ঘাড় মটকাবার জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে।···তা আসুন, এই তো এসেই গেছেন, দাঁয়েদের এই বাগানটুকু ঘুরেই··"

ও-ই এগুল, দুজনে পেছনে পেছনে চলল।

একবার ঘুরে দেখল মণীশ, ঘাটটা একটা ঝোপের আড়ালে পড়ে গেছে।

প্রশ্ন করতে করতে চলেছে লোকটা। উত্তর দিতেই হচ্ছে, তাই সেই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে মনটা যেন শক্ত মাটির স্পর্শ পেয়েছে। তারপর দেখলও—ডোবাটার ধারে দু'জায়গায় দুজন মানুষ—একজন একটু সোজা, একজন একটু হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে—আপাদমস্তক যেমন শাদা কাপড়ে ঢাকা, মেয়েছেলে বলেই মনে হয়।

কাছে আসতে টের পাওয়া গেল। হালকা কি সব গাছ, বোধ হয় ছোট ছোট বাবলা, শিশির-ভেজা মাকড়সার জালে প্রায় ঢাকা, জ্যোৎস্না পড়ে তার মধ্যে দুটো ঐ রকম বিভ্রম জাগাচ্ছিল দূর থেকে; হাওয়াতে দোলও দিচ্ছে তো মাঝে মাঝে···মনেও পড়ল—পাড়াগেঁয়ে এই সবই হচ্ছে ভূতের পঙ্গপাল। আর স্নানের সময়ও নয় তো এটা।

তবু মন যেন মানতে চায় না।

সুপারি বাগান থেকে নেমে এরা রাস্তায় পড়ল। লোকটা চলে গেল বাঁয়ে, এরা দুজনে ডাইনে ঘুরল।

বাড়িটাও এসে পড়েছে। কঠিন বাস্তব রূপ; মনটাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনবার মতোই। তবু মনে হচ্ছে—না, ঘাটে ওটা নিশ্চয় মাকড়সার জালে ঘেরা পাশের কোন ঝোপঝাড় ছিল না।···এখনই নিশ্চয় দেখা যাবে মালা পুকুর-ঘাট থেকে উঠে এসে তেমনি করে হাসিমুখে দোরের কাছটিতে আছে দাঁড়িয়ে।

৩

আরও খানিকটা বিভ্রম ঘটাল কুকুরে।

উঠানের এক কোণে বসে ছিল, মণীশ চৌকাঠ ডিঙোতেই ঝাঁউ ঝাঁউ করে ডাক দিয়ে উঠে একটু এগিয়ে এল—ঠিক তেড়ে আসা নয় —সঙ্গে সঙ্গেই ওপর থেকে একটা ধমক খেয়ে একটু থমকেই এক রকম ছুটে এসে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে উল্‌টে পাল্‌টে আদর কাড়াতে শুরু করে দিল। মণীশও সেই গত দিনেরই মতো ডাক দিল —"জিমি! জিমি!"

ওপর থেকে ভরাট গলায় প্রশ্ন হল—"কে?"

"আমি মণীশ।"

পুরোটা কানে যায় নি, প্রশ্ন হল—"কে মণি?"

"মণি নয়, মণীশ দাদু।"

"কে?···আসছি দাঁড়াও।"

ভারী, সতর্ক চালে আস্তে আস্তে নেমে এলেন ললিতমোহন। মণীশও ততক্ষণে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছে, নেমে আসতেই প্রণাম করে উঠে মুখের দিকে চেয়ে রইল। ওদিক থেকে অপরিচয়ের ভাবটা কাটে নি দেখে বলল—"চিনতে পারলেন না? আমি কিন্তু গলার আওয়াজ শুনেই চিনেছি দাদু। আমি হচ্ছি···"

"ও! মণীশ আমাদের! চিনেছি, চিনেছি, এই দেখো!...আর আওয়াজ শুনে চেনবার ক্ষমতা হারিয়েছি ভাই, পুরোপুরি তো কানেও যায় না সব সময়। আর দোষ দেবে কি ক'রে? তা তুমি হঠাৎ..."

ছেলেটা সুটকেস সামনে নামিয়ে বলল—"আমায় তাহলে..."

ওকে পকেট থেকে একটা চার-আনি বের করে দিয়ে, উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কুকুরটা অতিরিক্ত মাখামাখি ক'রে হাঁটু পর্যন্ত ঠেলে ওঠায়, মণীশ তাকে শান্ত করবার জন্য মাথায় হাত বুলিয়ে আবার আদর শুরু করল—"হয়েছে জিমি, হয়েছে। এখনও ঠিক সেই অভ্যেস, না দাদু?—বাড়িতে পা দিলেই শত্রু বলে ধরে নেবে, তারপর..."

"মণীশ এলে?...ঠিক এগারো বচ্ছর পরে।...জিমি কোথায়! ও হোল তার ছেলে। নাম হয়েছে টম। জিমি কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ঠিক মায়ের ধাত পেয়েছে বটে।...তা মণীশ, হঠাৎ কোথা থেকে বাবা?—উঃ, সেই কবে ..."

একজন একটু স্থূলকায়া বর্ষীয়সী বারান্দার শেষে পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। একটা অদ্ভুত শান্ত ভাব, যার জন্য এগারো বৎসর পরে সাক্ষাৎ হওয়াতেও কোন উচ্ছ্বাস নেই, কোন বিস্ময় নেই। চেহারা দেখলে বেশ বোঝা যায়, পূজার ঘরের মধ্যে থেকে সব শুনলেও ঠিক একই রকম স্থৈর্য আর নিষ্ঠার সঙ্গে পূজার শেষ মন্ত্রটি পর্যন্ত উচ্চারণ করে অচঞ্চল চরণেই এসেছেন বেরিয়ে।

প্রণাম করল মণীশ। উঠে ধূলার হাতটা অন্যমনস্কভাবে বুকে রেখেই বলল—"হঠাৎই একরকম জ্যাঠাইমা। মনে হল..."

একটু যেন সঙ্কুচিত হয়ে থেমে গেল, নিশ্চয় মনে পড়ে গিয়ে থাকবে আসবার আকস্মিকতার পূর্বাপর ইতিহাসটা। একটু সামলে নিয়ে আরম্ভ করল—"তবে, হঠাৎ বলছেন বটে জ্যাঠাইমা, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এগারো বচ্ছর কোথায়, এই সেদিন গিয়েছিলাম—আজ আবার এসেছি—যেমন আগে আসতুম—"

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—"এই দেখুন না—জিমির ছেলেটাকে

ভেবেছি জিমি। আর মনে হচ্ছে এলেই জিমির সঙ্গে আরও সবাই যেমন এসে ঘিরে দাঁড়াতো…"

এবার হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে একেবারে চুপ করে গেল। অন্ধকারে বোধ হয় কেউ টের পেল না, কিন্তু মুখটা যেন রক্ত হারিয়ে সহসা ছাইপানা হয়ে গেছে।

এবারে ব্যাপারটা একরকম আপনিই সামলে গেল। কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সব রকম বয়েসের, একটি মেয়ে বেশ বড়ই। দাছু সহজ কণ্ঠেই বললেন—"আসবে না কেন, আজও এসেছে, কিন্তু চিনবে তবে তো। এদের মধ্যে তো কয়েকজন জন্মায়ইনি তখন। সব চেয়ে বড় ঐ সিপু দিদি—তখন বোধ হয় বছর আটেরটি। কিগো গিন্নী, মনে পড়ে মণীশদাদাকে? কত তো আদর খেয়েছ…"

"সিপি তুই!"—বিস্মিতভাবে ঘুরে চাইল মণীশ।…"আদর না মনে পড়ে, মারগুলো তো থাকবেই মনে।…এদিকে সরে আয় তো দেখি।…দেখুন ব্যাপার! সেদিনকার সিপু, এতবড় হয়ে গেছে আজ 'তুই' বলে ডাকতেও যেন জিভে বাধে।"

জ্যাঠাইমা বললেন—"কথায় বলে মেয়ের বাড়, না, কলাগাছের বাড়, সেই রকমটিই থাকবে?…দাদাকে প্রণাম করতে হবে না?"

মেয়েটি লজ্জিত ভাবে এগিয়ে এসে পায়ের ধূলা নিল। তারপর ছোটদের মধ্যে ধূলা নেওয়ার কাড়াকাড়ি পড়ে গেল একটু। জ্যাঠাইমা বললেন—"চলো, ভেতরে চলো, বিচ্ছিরি রকম হিম পড়তে আরম্ভ করেছে এবারে, এরই মধ্যে। ঝুপ ঝুপ করে সব অসুখে পড়ছে। তারপর…তুমি এখন আছ কোথায়? আসছ কোথা থেকে?"

উত্তরটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য মণীশ বলল—"একটু ঘুরে দেখে নোব না বাড়িটা জ্যাঠাইমা? এদিকে তো এত পরিবর্তন যে আপনারা দুজন না থাকলে ধোঁকাতেও পড়ে যেতাম—এ কাদের বাড়িতে এসে ঢুকলুম।…আর সবাই…"

সামলে নিয়ে বলল—"তুমিও চলো সিপ্রা, দেখে আসি বাড়িটা…"

"এত শীগগির একেবারে!"

একটা হাসি ফুটি-ফুটি হয়ে উঠেছে দাছুর মুখে। মণীশ অত সব না বুঝে সহজ নিরীহ কথাটাই বলল—"এগারো বচ্ছর দেখিনি তো দাছু।"

"না, সেকথা বলছি না। বলছি—এত শীগগির সসম্ভ্রমে তুই থেকে তুমি, সিপি থেকে সিপ্রা?"

প্রচণ্ডভাবে হেসে উঠলেন। জ্যাঠাইমা সাবিত্রী দেবী মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিলেন, সিপ্রা ক্ষণিকের জন্যে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর যেন জোর করেই এক ঝোঁকে শরীরটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে একরকম দৌড়েই সামনের সিঁড়ি বেয়ে আড়াল হয়ে পড়ল।

একটু লজ্জার ছোঁয়াচ মণীশেরও লেগে গেছে। ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত, দাছুর কথাগুলাও এত আচমকা আর একেবারে নূতন ধরনের যে মনটা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সত্যই একটা অনুভূতি তার মনটাকে যেন ছুঁয়ে গেল যে সেই আট বছরের সিপ্রা উনিশ বছরে এসে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ধারাটা যেন বদলে দিয়েছে। কিন্তু সে নিতান্তই একটা খণ্ডিত মুহূর্তের জন্য। তখনই বেশ সহজ অনুযোগের কণ্ঠে বলতে পারল—"দাছুর রোগ গেল না। ছেলে-মানুষের সঙ্গে…আপনি তাহলে বসুন দাছু ঘরে গিয়ে। আমি জ্যাঠাইমাকে সঙ্গে নিয়ে একটু ঘুরে আসি।"

এক সিপ্রা ছাড়া সবাই রয়েছে। ঘুরে ফিরে খানিকটা দেখে বেড়াল। দেরি হয়ে যাচ্ছে তার কারণ মণীশের তো শুধুই দেখা নয়, তার সঙ্গে খোঁজাও। একটা অদ্ভুত ধরনের অনুসন্ধান—যাতে খোঁজা আর পাওয়া যেন একসঙ্গে রয়েছে মিশে। এ ঘরের ঐখানটা—বারান্দার ঐ থামের পাশে—সিঁড়ির ঐ ল্যাণ্ডিংটায়—মালা দুজনের ওঠানামায় যেন একটু পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল—মুখে মিষ্টি হাসি—বিষণ্ণ

প্রশ্ন—“আজই চললেন ?”···ঐ কাঞ্চন ফুলের গাছটা উঠানের ওদিকে মালা পুঁতেছিল—একদিন ঘাটে না দেখে ভেতরে এসে গ্যাখে নূতন পোঁতা গাছের গোড়া নিড়ানি দিয়ে আলগা করছে। বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে একটু ঘেঁষে গিয়ে নীচু গলায় বলে গেল—“আমার প্রতিদ্বন্দ্বী জুটল।”···মালার সেই বসে বসে ঘাড় ফিরিয়ে হাসিটি যেন গাছের গোড়াটিতে লেগে রয়েছে।

গল্প করতে করতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাদসাদ দিয়ে নিজের ইতিহাস একটু একটু দিয়েছে মণীশ, আসবারও একটা মনগড়া অজুহাত দিয়েছে। জ্যাঠাইমাও মোটামুটি এই এগারো বছরের ইতিহাস দিয়ে যাচ্ছেন প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে—কে কোথায়—কি করছে—কার বিয়ে হয়ে গেল, কার হবে—সবচেয়ে বেশি করে একটু জোর দিয়েই হোল অরুণার কথা—মেয়েছেলে আইবুড়ো ধিঙ্গি হয়ে রইল—স্কুল-মাস্টারি, সেলাই শিখিয়ে বেড়ানো, আর লেখা।··· মেয়েছেলে সংসারধর্ম করবে না, বই লেখা নিয়ে জন্ম কাটাবে—সব বোঝেন জ্যাঠাইমা, এটা তো মাথায় ঢোকে না।

অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মণীশ, অর্ধেক শুনে, আর অর্ধেক না শুনে। আর সবার কথাই হচ্ছে, শুধু একজন যে মনটাকে সবচেয়ে পূর্ণ করে রয়েছে তার প্রশ্ন যাচ্ছে না তোলা, তার প্রসঙ্গ পড়ছে না আপনা হতে এসে।

টম ডেকে উঠল ওর প্রথা মাফিক, তারপরে টের পাওয়া গেল কার পায়ে যেন লুটিয়ে পড়েছে। ছোটদের দল ছুটল সদরের দিকে। আগে খবর দিতে হবে—

“কে এসেছে বলো দিকিন রুণা দিদি ?···আমি বলছি রুণা পিসি —কী যে নামটা···টকটকে রং···মণীশবাবু···এগারো বচ্ছর পরে··· মণীশ কাকা গো !”

—নানা কণ্ঠে নানা ভঙ্গিতে।

বিস্মিত প্রশ্ন হোল—“মণীশ !! কৈ ?”···

…এসে পড়ল অরুণা। হাতে একগাদা বই, সেলাইয়ের সরঞ্জাম, খানিকটা ডিজাইন তোলা কাপড়।

খুব বিস্মিত। খানিকটা উত্তেজিতও, জ্যাঠাইমার ঠিক উল্টো। একসঙ্গে কতকগুলো প্রশ্ন বর্ষিত করে দিল—"কখন এলে?—কোথা থেকে?—এতদিন একেবারে কোন খবর নেই। আছ কেমন? করছ কি?"

তারপর যেন বেশ চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করে নিল—কথা আবার তিনজনে সহজ ভাবে এগিয়ে গেল। জ্যাঠাইমা স্বভাবে সংযত, অরুণা খানিকটা চেষ্টা ক'রে, মণীশও অন্যমনস্ক বলেই চেষ্টা করে সহজ করে নিচ্ছে নিজেকে।

"এবার একটু বাগানটা দেখে নোব না জ্যাঠাইমা?"

জ্যাঠাইমা আপত্তি করে উঠলেন—"না বাবা, কাল দেখবে, বাগান তো পালাচ্ছে না, ভেতরে চলো। কাকাও নিশ্চয় উতলা হয়ে রয়েছেন। আর দেখবে কি বাগান—যা কুয়াশা নেমেছে চারিদিকে!…"

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল মণীশ—

"ঠিক জ্যাঠাইমা, কুয়াশার কথায় মনে পড়ে গেল—এমন ধোঁকা লাগিয়ে দিলে তখন একটা, মনে হোল ঠিক যেন কে নেয়ে উঠে ঘাটের রানায় দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচলটা…"

"কাকে দেখলে!!—কার মতন!!"

অতিমাত্র উত্তেজিত হয়ে উঠেছে অরুণা, চোখ দুটো বিস্ফারিত—ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে।

এবার আর সামলানো গেল না। সবার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা এসে পড়ল। ছেলেমেয়েগুলো অবুঝ দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে রইল মুখের দিকে চেয়ে।

পরের দিন প্রভাতটি জগৎটাকে যেন সম্পূর্ণ নূতন বেশে নিয়ে এসে দাঁড় করাল মণীশের সামনে।

ঘুমটা ভেঙে গেল পায়ের ওপর একটা মৃদু উত্তাপের স্পর্শে। দেখল পুবের খোলা জানলা দিয়ে সূর্যের কিরণ এসে বিছানার প্রান্তে পড়েছে। একটু শীতল ভাব এসেছে হাওয়ায়, তাপটুকু লাগছে মিষ্ট, আলস্যে পড়েই রইল খানিকটা। শহরের একেবারে মাঝখানে, ঘিঞ্জির মধ্যে মীরাটের প্রভাতের চেয়ে কত আলাদা! এত নির্মল আলো সেখানে আসে না, বিচিত্র-কণ্ঠে পাখির এত গান নেই; সেখানে এখন হোটেলের চাকর রামখেলাওনের কলতলায় বাসন-কোসন বের করে দেওয়ার কথা, ঝি গোকুল-কী-মাঈ-এর জন্যে; কাকেরা এসে জটলা করছে।

জানলার গরাদের ফ্রেমে বাইরের খানিকটা নিয়ে যে একটা চিত্র আঁকা রয়েছে তার দিকে চেয়ে পড়ে রইল মণীশ। চলচ্চিত্র বলাই ঠিক, উজ্জ্বল নীল আকাশে দুটি পাখি পাশাপাশি উড়ে চলেছে, অনেক দূরে বলে অনেকক্ষণ ধরে দেখা যায়। বাগানের নারকেল আর সুপারি গাছের খানিকটা-খানিকটা দোল খাচ্ছে। ঘাটটুকু নিয়ে পুকুরেরও খানিকটা যায় দেখা। হাওয়ায় জলে চিকচিকে ঢেউ উঠেছে জেগে, দুটি হাঁস দোল খেয়ে গায়ে গায়ে ঘেঁসে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নাইবার তাড়া নেই, অফিসের তাড়া নেই, একটা দিন যার ভবিষ্যৎ নেই মোটেই; আলস্যটুকুকে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে পড়ে রইল মণীশ। মনটা আজ আশ্চর্যরকম স্বচ্ছ। মীরাট থেকে আরম্ভ করে কাল রাত্রি পর্যন্ত সেই যে একটা অদ্ভুত, আচ্ছন্ন, অন্যমনস্ক ভাব সেটা আর একেবারেই নেই। মনটা কোথায় ছিল, যেন কঠিন মাটির স্পর্শ পেয়েছে।

নিজে নিজেকে বিচার করতে বসেছে মন।

হঠাৎ কী এমন ঘটল যার জন্য নিতান্তই একটা অলীক আইডিয়ার পেছনে এই সাত-শ মাইল ছুটে বেরিয়ে এল সে! এগারো বৎসর আগে একটি মেয়েকে চোখে লেগেছিল, তারপর এই এগারোটা বৎসর একেবারে শূন্য; কি ভেবে এই শূন্যের গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ল একেবারে!…অনুতাপের কৃষ্ণ রেখাও ফুটে উঠল আজ প্রভাতের এই স্বচ্ছ মনের ওপর। অনেক সাধনায় এতদিনে কাজের একটা সুরাহা হয়েছিল, বাড়ি খুঁজছিল মণীশ, এবার হোটেল ছেড়ে উঠে যাবে…ক্যান্টনমেন্ট অঞ্চলের সেই বাড়িটা ভালোও লেগেছিল। ‥একেবারে সব সম্ভাবনা নষ্ট করে চলে এল। আশ্চর্য!

এর চেয়েও আশ্চর্য বোধ হচ্ছে কালকের রাতের সেই অভিজ্ঞতা —শিশির আর মাকড়শার জাল দেখে দিব্যি মনে করে বসল মালা স্নান করে উঠে আঁচল নিংড়াচ্ছে! সংগতি-অসংগতির কথা একবার মনে এল না!

এসব চিন্তা কিন্তু দাঁড়াতে পারছে না; এল আর চলে গেল। সমস্ত মন পূর্ণ করে রয়েছে ছবিতে-গানে আজকের প্রসন্ন প্রভাতটি; ঠিক যেন কে হাসি মুখে করে বসে রয়েছে বলে তার সামনে মুখ ভার করা যাচ্ছে না।

পাতলা সুজনিটাকে হাঁটু পর্যন্ত টেনে নিয়ে কোলবালিস জড়িয়ে পড়ে রইল মণীশ।…এই বেশ। একটা জীবন, নিঃসঙ্গ, তার জন্য এত কেন? প্রতিদিন অহোরাত্র আশা-আশঙ্কায় জীবনের ঝুলি ভরতে ভরতে এগিয়ে যাওয়া। কিসের জন্য? তার চেয়ে হাল তুলে নিয়ে হালকা স্রোতে নৌকা ভাসিয়ে দেওয়া ভালো।

যে ভাবে, যে কারণেই হোক, ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছে মণীশ। দেখল তো জীবনে—কে যেন টেনে টেনে নিয়ে যায়; দেখায় জীবনকে এই করে। সে-ই যেন একচোট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে আবার এখানে নিয়ে এসেছে; ওর নিজের জায়গায়।

এইখানে আছে ওর সেই নীল আকাশ, সেই শ্যামল শান্তি, যার জন্য ও কলকাতা থেকে ছুটে ছুটে আসত। এইখানে এইবার একটি নীড় রচনা করবে। ওর নীড় নিঃসঙ্গই হবে, পৃথিবীর যেখানেই থাকুক সেখানেই হবে নিঃসঙ্গ, তবু এখানে এই নিতান্ত অন্তরঙ্গ পরিবারটির সান্নিধ্য তো রয়েছে। কিছু একটা করবে, একজনের চলে যায় এমন করবার অনেক কিছুই পাওয়া যাবে—এ রকম একটা জায়গাতেও···

ভোরের পীত-আভা কেটে গিয়ে রোদটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বাড়ির সবাই জেগে উঠেছে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ উঠল, এগিয়ে আসছে, কয়েক জোড়া পা, এক সঙ্গে, তার মধ্যে দুটি পায়ের শব্দ একটু ভারী, এমন কি যেন চেনা যায় অরুণার স্বভাবচঞ্চল চরণক্ষেপ বলে।

দোরের সামনে এসে থেমে গেল। ছোটদের গলার একটা কৌতূহলপূর্ণ চাপা ফিসফিসানি। অরুণা বলল—"নাঃ, ঘুমুচ্ছেন ঘুমুতে দাও, তিন দিন ঘুম হয় নি। তোমরা বরং নীচে যাও, জাগিয়ে দেবে।"

ফিসফিস করেই যে বলল এমন নয়, অর্থাৎ জাগে তো জেগেই উঠুক মণীশ।

মণীশের কিন্তু আলস্যটা বড়ই মিষ্ট লাগছে, যেন তন্দ্রায় খানিকটা মেশানো। পড়েই রইল। ছোটদের নেমে যেতে বলে অরুণা এগিয়ে গেল।

মণীশ যে সাড়া দিল না তার একটা কারণ, যে কথাটা এইমাত্র মনে হোল—কিছু অবলম্বন করে এখানে থেকে যাওয়া, হঠাৎ অরুণার গলা শুনে তার যেন একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গেল।···এই তো অরুণা বেশ কিছু একটা নিয়ে রয়েছে। মাস্টারি, তার সঙ্গে সেবা।

মনের যা অবস্থা তাইতে অপরূপ এক শান্তির রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে কথা দুটি। হঠাৎ সব যেন সুরে-লয়ে মিলে গেল। নীল-

হরিতে ঘেরা এই শান্ত পরিবেশ, তার মধ্যে সেবা-শিক্ষকতায় একটি নিরুপদ্রব জীবন, আর কি দরকার ?

হঠাৎ একটু সতর্ক হয়ে উঠল, আর এক ধরনের আত্মপ্রশ্ন, শিক্ষিত মনের যা অভিশাপ, কোন কিছুকেই এক কথায় মেনে নিতে চায় না। প্রশ্নটা—ওর এটা কি মনের পলাতক বৃত্তি ? এসকেপিজ্‌ম্ ? স্মৃতির গায়ে একটা সুকঠিন আঘাত পেয়ে ও কি শেষে জীবন থেকে বিমুখ হয়ে পড়ল ?

অন্যমনস্ক হয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ও যেন প্রশ্নর উত্তর খুঁজে বের করতে লাগল। দিন আজ বড় স্পষ্ট, জগৎ বড় স্পষ্ট, কালকের কুহেলী আজ আর নেই। মালা থাকতে পারে না। কিংবা আছেই, তবে সে কোথাও বাস্তবের সমস্ত রূঢ়তা নিয়েই, সে-মালার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই আর।

কাল যেখানে মালা দাঁড়িয়ে আঁচল নিংড়াচ্ছিল, আজ ঠিক সেই ঘাটের রানার উপর দাঁড়িয়ে সিপ্রা চুলে গামছা জড়িয়ে চুল নিংড়াচ্ছে। মিথ্যাকে সরিয়ে একটা কঠোর সত্যকে যেন দুচোখ মেলে দেখছে এইভাবে নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মণীশ।··· প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছে মনকে।

না, এ ওর মনের অবসাদ নয়, কোনও দুর্বল ভ্রান্তিও নয়। একটা বিক্ষুব্ধ, ঝঞ্ঝাময় জীবনের প্রয়োজন নেই বলেই ওর মন আজ এই আশ্রয় খুঁজে নিল।

মনে এই যে একটু সংশয় উঠল এর জন্য আরও বেশী করেই এদিকে ঝুঁকে পড়ল মণীশ। অরুণা ফিরছে ওদিকে খানিকক্ষণ কাটিয়ে ; দরজার কাছ দিয়ে চলেই যাচ্ছিল ওকে না উঠিয়ে, মণীশ নিজেই ডাক দিল—"রুণাদি যাচ্ছ ?"

"উঠেছ নাকি ?"—বলে অরুণা দাঁড়িয়ে পড়ল। উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল মণীশ। প্রথম কথা—"জিজ্ঞেস করছিলুম এখানে কোন স্কুলে মাস্টারির কাজ খালি আছে ?···ছেলেদের

স্কুলে না হয় মেয়েদের স্কুলেই···মানে, তাও তো চলে আজকাল···”

একটু অবাক হয়েই মুখের দিকে চেয়ে রইল অরুণা, মুখে অল্প একটু হাসি টেনে ব্যঙ্গটাকে কতকটা মোলায়েম করে এনেই প্রশ্ন করল—“কালও ঘুম হয় নি নাকি ?”

৫

বয়স হিসাবে অরুণার সঙ্গে দিদি সম্পর্ক পাতাবার কথা নয় মণীশের, অরুণাই বছর তিনেক ছোট। ও দিদি হয়েছে গৌরবে ; গৌরবে বহুবচনের মতো।

বাড়িতে ভাই-বোনেদের মধ্যে ও তৃতীয়, দিদি হিসাবে সবার ওপর, কিন্তু সেজন্যও নয়। ওকে গুরুত্ব দিয়েছে ওর স্বভাব ; চেহারাও অনেকখানি।

ছিপছিপে, একটু ঢ্যাঙা, আর সিধা। ছেলেবেলা থেকে সুন্দরী বলেই জানে সবাই ওকে, কিন্তু সে সৌন্দর্যের সঙ্গে খানিকটা পুরুষালি ভাব মিশে, যারা ওকে ঈর্ষা করে তাদের মনটা করেছে হালকা।

এর সঙ্গে মিশেছে ওর স্বভাব। বরাবরই গম্ভীর, বরাবরই একটু যেন চিন্তিত, যার জন্য বয়সের চেয়ে ওকে খানিকটা বড়ই দেখিয়ে এসেছে। এর পর, দেহের গঠন আর মনের প্রকৃতির সঙ্গে যোগ দিল ওর শিক্ষা। মার্টিন লাইনের এতদূরে তখন স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন হয় নি বলাই চলে। ছেলেমেয়েদের জন্য একটি পাঠশালা —মেয়ে ক্বচিৎ—তাইতে পড়া শেষ হলে ও কলকাতায় গিয়ে উঠল। মণীশ ওকে প্রথম দেখে ওদের কলেজের হোস্টেলে।

অরুণার জ্যাঠামশাই অচলনাথ ছিলেন কলেজের প্রফেসার, এদিকে হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। প্রিয় ছাত্র হিসাবে মণীশের

যথেষ্ট যাতায়াত ছিল তাঁর কাছে, পড়া নিয়েও, আবার গল্প-গুজব, সলা-পরামর্শ নিয়েও ; লোকটি ছিলেন উদার প্রকৃতির। একদিন বেশ গম্ভীরভাবেই সলা চাইলেন—

"তোমায় অরুণার কথা বোধ হয় বলে থাকব, মনে থাকতে পারে (ওঁর নিজেরই বড় কম মনে থাকত), সেখানে প'ড়ে থেকে মাটি হচ্ছে, তাই ভাবছি, তাকে নিয়ে এসে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করে দিই ; আমার কাছে থাকবে। তোমার কি মত ?"

এতটা হকচকিয়ে গেল যে অরুণার কথা শুনেছে কি না শুনেছে সেটা আর মনেই রইল না মণীশের। আমতা আমতা করে বলল—"ইয়ে—অরুণা—সে মেয়ে তো স্যার ?"

"খুব শার্প্ মেয়ে। বাড়িতে কাকা পড়িয়ে দিয়েছেন, প্রায় ম্যাট্রিকের কাছাকাছি ; গ্রামে স্কুল নেই, তাই রান্না করতে শিখছে, ব্রতকথা শিখছে, এদিকে বিয়ের কথা হচ্ছে। অরুণার মতন স্মার্ট মেয়ে একটা ! বিপদের কথা নয় ?"

মনে মনে নিশ্চয় বিপদের কথাই স্মরণ করে মণীশ আবার আমতা আমতা করে বলল—"কিন্তু এখানে স্যার, ছেলেদের হোস্টেল·· আপনি সব সময় হয়তো থাকবেনও না···"

একটু হেসে বললেন—"যখন থাকব না, মরুভূমিতে পড়ে থাকবে না তো, বিয়াল্লিশজন ছেলে এ হোস্টেলে !"

ওর আশঙ্কা যে কতটা অমূলক সেটা বোঝাবার জন্যে সেইভাবে চেয়েই রইলেন একটু। তারপর বললেন—"না মণীশ, বাপমা-মরা মেয়ে, এভাবে ওর জীবনটা নষ্ট হতে দিলে ওর প্রতি ঘোর অবিচার করা হয়। ওর মধ্যে যথেষ্ট প্রমিস্ রয়েছে। কি বল তুমি ? সব তো শুনলে।"

একটা কাজে কলেজ থেকে দিন দশেক অনুপস্থিত ছিল মণীশ, গিয়েছিল বাইরে। যেদিন ফিরল, বিকালে হোস্টেলে এসে দেখে একটি বছর পনের-ষোলর মেয়ে ঘরের টেবিলের বইপত্র ঝেড়ে

গোছগাছ করছে। পাশাপাশি দুখানি ঘর নিয়ে থাকেন অচলনাথ, তিনি অনুপস্থিত। মেয়েটি হাত থামিয়ে একটু কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল। মণীশ প্রশ্ন করল—"নেই উনি বাসায় ?"

খুব যে সপ্রতিভভাবে বলতে পারল এমন নয়।

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ দৃষ্টিই মুখের ওপর তুলে ধরে বলল—"কমিটির একটা মীটিং আছে, তাইতে গেছেন।"

"ও, তাহলে যাই।"

"না, যাবেন কেন, বসুন। আপনি বোধ হয় মণীশবাবু ?"

"হ্যাঁ।···কিন্তু তাঁর তো দেরি হবে।"

"বোধ হয় হবে না, কেন না অনেকক্ষণ তো গেছেন। হলেও আপনি না হয় বসলেনই একটু।···বসুনই।"

একটা চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, একটু ঠেলে দিল। মণীশ বলল—"একটু ঘুরে এলে চলবে না ?"

প্রশ্নটা এতই বেখাপ্পা হয়ে গেল যে নিজের কানেই লেগে আরও একটু বিপর্যস্ত করে দিল। ওদিকেও এড়িয়ে যায় নি। মেয়েটির মুখে অল্প একটু হাসি ফুটল, উত্তর করল—"না চলবার কি আছে! তবে জ্যাঠামশাই এসে যদি জিজ্ঞেস করেন···"

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল মণীশ, নিজেকে সপ্রতিভও করে নিল ; প্রশ্ন করল—"জিজ্ঞেস করবেন—কিন্তু আমি যে আসবই তা তো জানতেন না তিনি।"

"আশা করেছিলেন। রোজই তো বলেন—আপনি বড় দেরি করছেন এবার।"

একটু চুপচাপ গেল। মেয়েটি বইগুলো গুছিয়ে রাখছে। মণীশও মনটাকে আর একটু গুছিয়ে নিল ; অল্প একটু হাসি টেনে এনে প্রশ্ন করল—"কিন্তু আমি যে মণীশ তাই বা আপনি টের পেলেন কি করে ?"

"খানিকটা অবশ্য আন্দাজেই। তা ভিন্ন হোস্টেলের প্রায় সবারই মুখ চেনা হয়ে গেছে তো।"

"কতদিন এসেছেন আপনি ?…ইয়ে, আপনিই ওঁর ভাইঝি অরুণা দেবী তো ?"

"হ্যাঁ, আমার নামই অরুণা। গেল রবিবারের আগের রবিবার জ্যাঠামশাই আমায় গিয়ে নিয়ে এলেন।…আপনি বসুন, আমি একটু চা করে দিই। ততক্ষণে উনি এসেও পড়বেন।"

পাশের ঘরেই স্টোভ জ্বেলে চা করতে লাগল। চা শেষ হলে একটু হালুয়াও চড়িয়ে দিল মণীশের মানা না শুনে। তারই মধ্যে গল্প হতে লাগল। ভর্তি হয়ে গেছে অরুণা; মেয়েদের স্কুলেই, ম্যাট্রিক ক্লাসে।…হ্যাঁ, ভালোই লাগছে, তবে এক একবার, একটু একলা পড়ে গেলে বাড়ির জন্যে মনটা কেমন করতে থাকে।

কথাটা বলা ঠিক হবে কি হবে না একটু ভেবে নিল মণীশ। বারান্দায় ছেলেরা যাওয়া আসা করছে, সিঁড়িতেও ওঠা নামা চলছে, দু'একজনের দৃষ্টিও যে এ ঘরের পানে এসে না পড়ছে এমন নয়, নিজেরই কেমন যেন লাগে। তবু এই সদ্য পরিচয়ই তো, বলতে জিভে যেন আটকে যাচ্ছে; শেষে বলেই ফেলল—"আর আপনি পড়েও গেছেন একেবারে বেটাছেলের মধ্যে তো।"

ভাজা সুজির ওপর জল ঢালায় ছ্যাঁক করে একটা আওয়াজ হোল, অরুণা প্রশ্ন করল—"কি বললেন ?"

"বলছিলুম—পড়ে গেছেনও একেবারে একা।"

"একা কি করে বলছেন ? বিয়াল্লিশজন ছেলে হোস্টেলের এ উইংটায়, এতেও যদি একা মনে হয়…"

ওর কথার অসংগতির জন্য একটু হাসল, তারপর সহজভাবেই বলল—"বড়দের জন্যেও ততটা নয়, মন কেমন করে ছোটগুলোর জন্যে। গেল রবিবার একবার ঘুরে আসব ভেবেছিলুম, ওঁর ফুরসৎ হোল না। দেখি এ রবিবার যদি হয়।"

শনিবার বিকালে দেখা করতে এসে দেখে, অচলনাথ কতকটা যেন বিব্রতভাবে হাত পা এলিয়ে বসে আছেন, যাত্রার প্রস্তুতিতে

টেবিলের ওপর স্থটকেসটা রাখা, অরুণা একটু সাজ-গোজ করেই কতকটা মুখ চুন করে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

মণীশকে দেখেই বলে উঠলেন—"এই যে মণীশ, এসো, এসো, একটা সলা-পরামর্শ আছে।"

হাতঘড়িটা দেখে বললেন—"আর সময়ই বা কোথায়!··· পরশু দিন ছেলেরা একটা স্ট্রাইকের মতলব এঁটেছে, জান নিশ্চয়।"

মণীশ সবিনয়ে বলল—"আমি তার মধ্যে কিন্তু নেই স্যার। আরও অনেকে নেই, আমরা বুঝোচ্ছি সবাইকে···"

"বুঝোও, সে কথা বলছি না, বলছি প্রিন্সিপ্যাল এইমাত্র বলে পাঠালেন সেই নিয়ে আজ সন্ধ্যেয় একটা এমারজেন্ট্ মীটিং কল করছেন। এদিকে আমার সব ঠিকঠাক, অরুণাকে একবার নিয়ে যাব—মনটা বড় উতলা হয়েছে ওর, স্বাভাবিকই তো?···এই অবস্থা, কি করি বল এখন।"

মণীশ একবার স্থটকেসটা, একবার অরুণাকে দেখে নিয়ে কি বলবে ভাবছিল, উনি নিজেই বললেন—"আমি করেছি একটা ব্যবস্থা, এত তাড়াতাড়ি যা হতে পারে। বলছি পাশের ঘরের শচীশ্বর ওকে না হয় রেখে আস্থক, আসবার ব্যবস্থা সেখান থেকে করে দেবে একটা। শচীশ্বর রাজীও আছে, কিন্তু অরুণাকে মোটেই রাজী করা যাচ্ছে না। সেই বোঝাচ্ছিলাম, এমন সময় তুমি এসে হাজির হলে। গড্-সেণ্ড্ (God-send) বলতে হবে। বেশ তো, শচীশ্বরের সঙ্গে না যেতে চায় তোমার সঙ্গে যাক; এতে তো আপত্তি থাকতে পারে না?"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একটু চেয়ে রইলেন।

"তাহলে কিন্তু তুমি যেমন আছ তেমনিই বেরিয়ে পড়তে হয়। আমি তোমার বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।···এই তিনটে সতেরো হয়েছে, পাঁচটায় গাড়ি। একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে আনছি। কেমন?"

ব্যবস্থাটা ঠিক করে ভাইঝির দিকে চেয়ে বললেন—"কি, আর আপত্তির কিছু রইল না তো?"

"না হয় থাকতই আজ, এমন কি···"

—কথাটা বলে নিশ্চয় সাহায্যের জন্যই একবার মণীশের দিকে চাইল অরুণা। সঙ্গত একটা আপত্তি খুঁজে বের করতে তার যেটুকু দেরি হল, তার মধ্যে অচলনাথই আরম্ভ করে দিলেন—"তোমার কিছু ভাবনা নেই; শুধু সঙ্গে যাওয়া। অরুণা চালাক মেয়ে, তোমায় চালিয়ে নিয়ে যাবে।···তুমি জান না, ওর দাদারাও ওকে দিদি বলে!"

একটু হেসে নিয়ে বললেন—"বেরিয়ে পড় তা হলে, আমি নিশ্চিন্দি।·· এই ছাখো, ভাগ্যিস নজরে পড়ে গেল! রুণা, টর্চটা স্যুটকেসে নিয়ে নাও মা, একটু অন্ধকারই হয়ে যাবে।"

৬

সেই থেকে অরুণা ওকে চালিয়ে নিয়ে আসছে বললে ভুল হয় না।

বাড়ি গিয়ে দেখল বয়সের অনুপাতে পরিবারের মধ্যে সত্যই বিশিষ্টা ও; ও বাইরে গেছে একটা জায়গায় খানিকটা শূন্যতা সৃষ্টি করেই। তখন পুরাতনের কোলে নূতন সংসারের গোড়াপত্তন হচ্ছে, পূর্ণতার দিকে এগিয়ে আসছে পরিবারটি। অরুণার দুই জাঠতুতো দাদাদের মধ্যে ছোটর সদ্য বিবাহ হয়েছে, বড়র বিবাহ হয়ে গিয়ে তিনটি ছেলেমেয়ে। নিজেরও ছোট ভাই-বোন মিলে সাতটিতে বাড়ি মাতিয়ে রেখেছে।

বাড়িতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভাই ষষ্ঠীচরণ আপত্তি তুললেন—"না রুণাদি, তোমার আর ফিরে যাওয়া হবে না, কাকাকে লিখে দিচ্ছি আমি।"

অরুণা একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল—"কেন বড়দা? না, সে হবে না, আমার বেশ মন বসে আসছে ওদিকে···"

"আমরা এখানে পালাই-পালাই করছি। মাকে জিজ্ঞেস করো।"

জ্যাঠাইমা হেসে বললেন—"কচিকাচাগুলো একটু রাশ-আলগা পেয়েছে তো; মাস্টার মানুষ, লেখাপড়ার মধ্যে আলাতন হয়ে যায় ও।"

"শুধু কচিকাচা কেন মা? তাদের না হয় রাশ-আলগা হয়েছে, দাদুও একটু খিটখিটে হয়ে উঠেছেন, হন নি?"

"ওঁর কথা ছেড়ে দাও; রুণা না হলে মেজ বৌমা—তা তিনি বাপের বাড়ি থেকে এলেই আবার ঠিক হয়ে যাবে।"

"ততদিন থাকুক তাহলে রুণাদি…"

"বাঃ রে! ··গাজুরি!" অরুণা বলে উঠল।

"তাহলে অন্তত যাওয়ার আগে মাকে কাশী পাঠিয়ে দিয়ে তারপর যাও। রোজ আরম্ভ করেছেন।"

সাবিত্রী দেবী হেসে গালে আঙুল চেপে ধরে বলে উঠলেন—"অবাক করলি ষষ্ঠী!···মেজ বৌমা পানটা ছাঁচতেন ভালো মা; বড় বৌমাও ভালোই ছাঁচেন, সবগুনোকে সামলাতে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গিয়েছিল, তাই পোড়া মুখ দিয়ে কেমন বেরিয়ে গেল—দে আমায় কাশী পাঠিয়ে।···যেন সত্যিই বলতে পারে মানুষে! বুড়ো শ্বশুর ঘরে, নিজে গিয়ে কাশী বসে থাকব!—ঝাঁটা মারো আবদারের মাথায়। এখানেই কাশী আমার—যদ্দিন আছেন উনি।"

যে বিশেষ ভরসাস্থল, যাকে বেশী করে ভালবাসা যায় তাকে ফিরে পেলে যেমন হয়—সমস্ত বাড়িটি প্রীতির অনুযোগে অকারণ হাসি-আলাপে ছলছল করে উঠল।

একটা দিন ছিল মণীশ। শাসনের রহস্যটাও বুঝল।

ঠিক শাসন নয়। কচিকাচাদের জন্যে অরুণার ভেতর একটা গভীর স্নেহ-প্রবাহ রয়েছে, যার ওপরটা বলতে পারা যায় ফল্গুর মতো রুক্ষ। অতটাও নয়। ওদের দলে সারাদিনে কয়েকবারই দেখল—যদিও যেন সব জায়গাতেই রয়েছে—দেখল খেলাধুলা,

আদর-কৌতুকের মধ্যেই, তবে লক্ষ্য করল একটু কোথাও ছন্দপতন ঘটলেই বড় বড় চোখ ছুটি হঠাৎ শান্ত, স্থির হয়ে উঠছে—একটু মুখ ফিরিয়ে চাওয়া, ঠিক তিরস্কারও বলা যায় না, যেন নীরব ইঙ্গিত মাত্র —'তোমার কাজটা মনের মতো হোল না'—এইতেই সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে, কথাবার্তা, গতিবিধি আবার নিজের ছন্দে আসছে ফিরে।

এই শান্ত চোখে, ঈষৎ-গম্ভীর ক্ষণিক ভঙ্গিতে পনের-ষোল বছরের মেয়েটি হঠাৎ যেন মাথা ছাড়িয়ে ত্রিশে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে, যেমন একএকবার নেমেও আসছে ওদের নিম্নতম স্তরে। কয়েক-বারই নজরে পড়ল নিজের বয়স ছাড়িয়ে ওর এই ওঠানামা।

সুটকেসে ভরা ছিল ওদের জন্যে কেনা খেলনা, টুকি-টাকি।

এর মধ্যেই জ্যাঠাইমার, দাছুর ডাকে সাড়া দিয়ে যাওয়া আছে, রান্নাঘরে ভাজের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি আছে। তার যেন একবার একটু বাড়াবাড়িই বলে মনে হোল মণীশের কাছে, পুকুরে নেয়ে উঠান দিয়ে আসতে আসতে যখন রান্নাঘরের দিকে হঠাৎ নজরটা পড়ে গেল। ভাজ মণীশের দিকে যেভাবে একটু চাইল, তাইতে অরুণাও যেমন হঠাৎ ঘাড়টা ঘুরিয়ে চাইল, যেমন একটু জড়োসড়োও হয়ে পড়ল, তাতে প্রসঙ্গটা যে মণীশকে নিয়েই এ রকম একটা সন্দেহ সহজেই জেগে উঠল ওর মনে। কারণও তো যথেষ্টই রয়েছে।

একটু তাড়াতাড়িই জলখাবার নিয়ে উপস্থিত হোল অরুণা, নিজেই এল; তখন মণীশের চুল আঁচড়ানোও হয় নি। মুখের ভাবটা বেশ সহজ। যেমন হোস্টেলে থাকে। এই একটু আগে ভাজের রহস্যালাপে যে ব্রীড়া-সঙ্কোচটুকু ফুটে উঠেছিল তার লেশ মাত্র নেই।

প্রথম পরিচয়ের এটুকু বরাবরই মনে ছিল মণীশের। অনেক পরে প্রসঙ্গক্রমে একদিন এইটে ভেবেই বলেছিল—"তুমি একটা মির‍্যাকল্ রুণাদি, অবস্থা-গতিকে আর যে-কোন মেয়েই যা করতে পারত না তাও তোমায় করতে দেখেছি।"

পরিবারটি বড় ভালো লাগল মণীশের, অনেকখানি পুরাতনের

সঙ্গে অনেকখানি নূতন মেশানো। ওকে ওরা বেশ সহজ অভ্যর্থনার সঙ্গেই গ্রহণ করল, অন্য সংসারে যা হয়তো সম্ভব হত না। ওর এ-ভাবে অরুণার সঙ্গে আসা, কতকটা একজনের পাগলামি, অন্য সংসারে এটা ভালোর চোখে দেখত না, বরং ব্যবস্থাটাতে ওর একটা গায়ে-পড়া ভাব আছে ধরে নিয়ে খানিকটা বিমুখ হয়েই থাকত।

সবাই ডেকে কাছে বসিয়ে আলাপ করল। এমন কি অরুণার ভাজ পর্যন্ত। তার আলাপে কোথায় একটু কৌতুক-রহস্য ছিল, কিন্তু তা এত সূক্ষ্ম, এত ক্ষীণ যে কথাবার্তায় একটা সরস মিষ্টতা ভিন্ন কিছুই পরিচয় রইল না তার। সব চেয়ে বেশী আলাপ করলেন জ্যাঠাইমা সাবিত্রী দেবী, বর্ষীয়সী গৃহকর্ত্রী হিসাবে যাঁর নাকি একটু স্পষ্টভাবেই গম্ভীর থেকে যাওয়ার কথা। তিনি যেন মণীশকে পেয়ে সবচেয়ে বেশী করেই কৃতার্থ হয়েছেন। বললেন—"তোমার কথা মেজঠাকুরপোর কাছে অনেক শুনেছি বাবা। কতদিনই বা কলকাতায় চাকরি নিয়ে এসেছেন বর্ধমান থেকে, কিন্তু তোমার কথা প্রায়ই বলেন। বড় বুদ্ধিমান ছেলে, সলা-পরামর্শ দেয় যেন কত পাকা মাথা!···বলি, একবার সঙ্গে করে নিয়ে এসো না, দেখি সবাই। খেয়ালী মানুষ, একজন ভালো পরামর্শ দেওয়ার লোক থাকে কাছে-পিঠে, সে তো ভরসার কথা।"

এমন সহজ স্নেহে কথাবার্তা যে অল্পেই যেন কতদিনের আপনজন করে নিয়েছেন। একটু হাসি-খুশি রহস্যের ভাব লেগে থাকায় সাহসও বেড়ে যায়। তার জন্যেই এরপর সুযোগ বুঝে নিজেকে মুক্ত রাখবার জন্য যে কথাটা বলল, সেটা পারল বলতে মণীশ।

একটু হেসে বলল—"খেয়ালী মানুষ, ভালো সলা-পরামর্শের যশ দেন, কিন্তু খেয়ালের বশে শোনেনও না তো কারুর কথা—কত বললাম—আমার সময় নেই, আমি যেতে পারব না সঙ্গে, তা···"

"না বাবা, এসে ভালোই করেছ। তুমি বাড়ির ছেলেই হয়ে আছ অনেকদিন থেকে। আসবে, এসে থাকবে ছুটিছাটা হলে; এটাকে তো আর আসা বলব না।"

ললিতমোহনের উপস্থিতি পরিবারটিকে যেন আরও মধুময় করে রেখেছে। উনি সাবিত্রী দেবীর খুড়শ্বশুর আর সবার দাদু। একটু পরিহাস-প্রবণ, তাইতে সর্বদাই একটি মিষ্টি রসের স্রোত বইতে থাকে যেন বাড়িটিতে। নূতন এসে মণীশও বাদ গেল না।

অরুণাকে রেখে রবিবারের সকালেই ফিরে যাওয়ার কথা, কিন্তু বেশী করে জ্যাঠাইমার কথা এড়াতে না পারার জন্যই থেকে যেতে হোল। রাত্তিরটাও। একটু অসুবিধা হোল, গিয়েই কলেজ করতে হবে, একটা ক্লাস বাদও দিতে হবে, তবু না নেয়ে-খেয়ে যেতে দিলেন না জ্যাঠাইমা।

বাড়িতে সহজেই অরুণার সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ হয় নি। কিন্তু আর সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ায় ওর সঙ্গে ব্যবধানটা আপনি-আপনিই গেল মিটে।

খানিকটা সুবিধাও হল। ষষ্ঠীচরণ স্টেশনে এসেছিলেন, টিকিটও নিজেই কেটে নিয়ে এলেন ; সেকেণ্ড ক্লাসের।

মণীশ মৃদু আপত্তি তুললে বললেন—"এ সময়টা ডেলি প্যাসেঞ্জারের ভিড়, রবিবার গেছে, ইণ্টার ক্লাসে কষ্ট হবে তোমাদের।"

গাড়ি এলে দুজনে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসল। গাড়ি খালিই, অপর দিকে সুটপরা প্যাসেঞ্জার একজন শুধু।

গাড়ি ছেড়ে দিতে গল্প আরম্ভ হতে দেরি হোল না, জমে উঠতেও নয়—কলেজ, স্কুল, হোস্টেল, যে কথাই এসে পড়ে।

একসময় অরুণা প্রশ্ন করল—"আমাদের বাড়িটা কেমন লাগল বলুন।"

"খুব চমৎকার, আশ্চর্য রকম।"

প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। আশ্চর্য রকম ভালো—সবাই এত ভালো—এ রকম সংসার দেখে নি এর আগে। সবার নাম ধরে ধরেই প্রশংসা করল, বলল—"এক মুহূর্তের জন্য কেউ মনে করবার ফুরসৎ দিলেন না যে বাড়ি ছেড়ে আছি।"

অরুণা কি ভেবে বলল—"নিশ্চিন্দি হলুম শুনে।···আমার দোষটা তো রয়েই গেল—সঙ্গে করে নিয়ে এলেন এত কষ্ট করে, অথচ একবার ঘুরেও দেখতে পেলুম না, কেমন আছেন, কি করছেন। আমার সম্বন্ধে কি ধারণা নিয়ে যাচ্ছেন জানি না।"

নিশ্চয় অনুতাপের সুরটুকুর জন্যেই প্রশংসাটা আরও নিঃসঙ্কোচ করে বসতে পারল মণীশ, মন্তব্যটুকুও জুড়ে দিতে পারল। বলল—"আপনি তো আরও আশ্চর্য···রকম···ভালো। দেখলুম তো, ফুরসৎ থাকবে কি করে···তাই মনে করছি এবার থেকে আমিও······"

থেমে যেতে অরুণা প্রশ্ন নিয়ে চাইল। মণীশ একটু হেসে বলল—"মনে করছি এবার থেকে আমিও রুণাদি বলেই ডাকব।"

একটা লজ্জিত কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল অরুণার দৃষ্টিতে, বলল—"তা বলুন, বড়দা পর্যন্ত যখন সম্বন্ধ পালটে দিয়েছেন। কিন্তু 'আপনি' জুড়ে দিয়ে যেন আরও গুরুগম্ভীর করে তুলবেন না সম্বন্ধটুকু।"

৭

নামের সঙ্গে 'দিদি' কথাটুকু যুক্ত থাকায় প্রথম পরিচয়ের মধ্যে সঙ্কোচটা গোড়া থেকেই বাদ রইল; কথাবার্তা, মেলামেশা, দেওয়া-নেওয়া সব কিছুই সহজ হয়ে উঠল, এমন কি হাসি-ঠাট্টাও; একটি মুক্তির মধ্যে দিয়ে দুজনে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। টের পাওয়াই গেল না তার মধ্যে কবে অরুণাও 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' আরম্ভ করে দিয়েছে, যেন নিজের গুরুত্বটা খানিকটা মেনে নিয়েই। ঘনিষ্ঠতার আরও একটা কারণ হোল। অচলনাথ বিজ্ঞানের অধ্যাপক, কতকটা সেজন্যও এবং কতকটা নিত্য যায়-আসে বলেও অরুণাকে পড়ানোর খানিকটা মণীশের হাতে গিয়ে পড়ল। প্রথমে অনিয়মিত ভাবেই,—পাঠ্যপুস্তকের একটা কিছু প্রসঙ্গ উঠল, কাছে আছে বলে মণীশও

যোগ দিল, সমাধানে সাহায্য করল। ক্রমে মণীশ এসে পড়ায় অচলনাথ বোধ হয় তার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজে মন দিলেন। এই করে অরুণাকে নিয়ে সন্ধ্যার সময় ঘণ্টাখানেক, ঘণ্টা দেড়েক বসা একসময় একটা নিয়মিত রুটিনের মধ্যে এসে পড়ল মণীশের।

হোস্টেলের একটু বক্রদৃষ্টি যে না এসে পড়তে লাগল এমন নয়, নেপথ্যে একটু টীকা-টিপ্পনীও উঠতে লাগল।

সে সবও আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে খুব বেশী সময় লাগল না। যা রইল তা এত নেপথ্যে চলে গেল যে আর বিশেষ ধর্তব্যের মধ্যে রইল না, এত বড় হোস্টেলটায় এমন সব ছেলের জন্য একটা নিভৃত কোণ তো থাকবেই আলাদা।

মিলিয়ে এল অনেকগুলো কারণে। তার মধ্যে অচলনাথের ব্যক্তিত্ব এক। আত্মলীন, শান্ত গাম্ভীর্যের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যার জন্য ওঁর সম্পর্কীয় কোন কিছু নিয়েই কুটিল নীচতার কিছু যেন কাছেই ঘেঁষতে চায় না। দ্বিতীয় কারণ মণীশ। ভালো স্কলার বলে কলেজে একটা পরিচয় আছে ওর, হোস্টেলে পূর্ব থেকেই ওর যাতায়াত বেশী রকম, তাই থেকে অন্তত এখানে সবার মধ্যে তার পরিচয়টা আরও বেশী, কোন রকম একটা নীচ সংশয় টিঁকতে পারল না। তৃতীয় কারণ এবং প্রধান কারণ অরুণা নিজে।

কথা হচ্ছে, একটা পর্দার আড়াল রাখলে, সেই পর্দার আড়াল থেকে সন্দেহ পায় উঁকি মারবার সুযোগ, বিদ্রূপ হানতে পারে তার বাঁকা হাসি; অরুণা এক রকম গোড়া থেকেই তার পথ মেরে দিল —চেষ্টা করে নয়, তার স্বভাবেই।

ব্যাপারটার গোড়াপত্তন হোল ওর আসবার কয়েক দিন পরেই। ঘরের চাবি দুজনের কাছে দুটো থাকে, সেদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখল নিজের চাবিটা ঘরেই ফেলে গেছে।

সকাল সকাল ছুটি হয়ে যাওয়ায় স্কুল থেকে এসেছেও আগে,

একটু আতান্তরে পড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর সিঁড়ি দিয়ে একটি ছেলেকে উঠে আসতে দেখে বলল—"একটু শুনবেন এদিকে ?"

ছেলেটি এগিয়ে এল।

"একটু সাহায্য করতে হবে। মেজ-জ্যাঠামশাই কোন্ ক্লাসে এ সময়টা যদি জানেন ; চাবিটা চাই তাঁর···"

"আপনারটা···?"

অবান্তর প্রশ্নটা করতে গিয়ে থেমে গেল ছেলেটি। অরুণা একটু হেসেই বলল—"আর লজ্জা দেবেন না, ভেতরেই ফেলে গেছি আজ।"

ছেলেটি নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ল, বলল—"আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।"

একটু বিমূঢ়ভাবে বলল—"খানিকটা হয়তো দেরি হতে পারে। কোন্ ক্লাসে আছেন খোঁজ নিয়ে···অনেক সময় আবার অনুরোধে অন্যের ক্লাসও নিতে হয় ; আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন ততক্ষণ ?"

"বারান্দায় পায়চারি করছি।"

বারান্দাটা এমুড়ো-ওমুড়ো একবার দেখে নিল ছেলেটি। ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, কি বলতে যাচ্ছিল, আর না বলে চলে গেল নিজের ঘরে। খান পাঁচেক ঘর পরে, তার মধ্যে তিনটিতে তালা দেওয়া। একটু পরে মাথা দিয়ে একটা কামিজ গলাতে গলাতে বেরিয়ে এসে বলল—"আপনি ততক্ষণ না হয়···"

একবার ভেতরের দিকে চাইল। আরও দুটি ছেলে বেরিয়ে এল দরজার সামনে, একজন বলল—"আপনি ভেতরেই এসে বসুন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন ?"

অরুণা সামান্য একটু ভেবে নিয়ে এগিয়ে গেল, ছেলেরা আর একটু বাইরের দিকে চলে আসতে প্রশ্ন করল—"আর আপনারা ?"

"আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি।"

অল্প একটু হাসল অরুণা, বলল—"তার চেয়ে আমি একা বাইরে থাকা তো ভালো।"

ও ছেলেটি চলে গেল। ওরা তিনজনে গিয়ে ভেতরেই বসল। ছেলে-দুটি বিছানা-গোটানো চৌকিটায়, অরুণা একটা যে চেয়ার ছিল তাইতে।

তিনজনে একটু জড়ভরত হয়েই রইল বসে। তবে বেশীক্ষণ এ-ভাবে থাকতে হোল না। যে-ছেলেটি গিয়েছিল তার সঙ্গে একটু হন্তদন্ত হয়েই এসে উপস্থিত হলেন অচলনাথ, বললেন—"বেরুবার সময় দেখি টেবিলে চাবিটা ফেলে গেছ। কাউকে দিয়ে যে যাব, তা অন্যমনস্ক হয়ে আমিও পকেটে ফেলে নিয়ে গেছি। ভুলেই গিয়েছিলুম বেবাক, পকেটে হাত পড়তে বুঝলুম, খুব কীর্তি করেছি; তাড়াতাড়ি ছুটে আসছি, পথে সুভাষের সঙ্গে দেখা।"

কথা কয়ে যেন বাঁচল অরুণা, বলল—"কীর্তিটা তো আসলে আমার জ্যাঠামশাই।"

হেসে উঠে পড়ল। অচলনাথ ছেলে দুটির দিকে চেয়ে বললেন —"ডেকে নিয়ে গল্প করছিলে? বেশ, বেশ। এখনও ওকে ইন্‌ট্রোডিউস করা হয় নি তোমাদের কাছে, অথচ তোমাদের ভরসাতেই ওকে এনে রাখা এখানে···"

অরুণা বেশ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে, হেসে বলল—"কেমন করে বলছেন তা? আমায় ঢুকতে বলে ওঁরা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। হোস্টেল খালি করে দিতে তো আনেন নি আমায়।"

পরিচয়টা এইভাবে বেড়ে চলল, একটু একটু করে মেলামেশাও। অরুণার প্রকৃতি হচ্ছে—যেমন একেবারেই গায়ে পড়া নয়, তেমনি প্রয়োজনে এড়িয়ে যাওয়ারও সঙ্কোচ নেই একেবারে, এগিয়ে যায়। পরিচয়টা বেড়ে গেল, ছেলেদের অসুখ-বিসুখের মধ্যে দিয়েও বেশ খানিকটা। অনেকগুলি ছেলে, দু'একজনের লেগেই থাকে, এ বিষয়ে অচলনাথ একটু নার্ভাস প্রকৃতির, কারুর সামান্য কিছু হলেই বিহ্বল হয়ে ওঠেন, অরুণা তাঁর পাশে সেবা আর সাহস নিয়ে দাঁড়াল।···একবার এমন হোল, স্কুল ছিড়িকে বাড়ি আসায় ওর চারটে রবিবারই বাদ গেল এক মাসের মধ্যে। যখন এল, অচলনাথ

বললেন—"এই রকমই হবে এইবার, রুণা সেখানেও ওর সংসার পেতে নিয়েছে।"

অরুণা হোস্টেলে নিতান্তই সহজ হয়ে উঠল। হোস্টেলে ছোটখাট কিছু একটা হলে তার মধ্যেও অরুণা আছে।

তারপর হোল বাড়ির মতোই বিশিষ্ট।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার মাস তিনেক আগে ওকে নিয়ে এসেছিলেন অচলনাথ, পাশ করার পর মেয়েদের কলেজে না দিয়ে এখানেই ভর্তি করে দিলেন; যা তখনকার দিনে একটা খুব সাধারণ ব্যাপার ছিল না। কলেজের ছাত্রী হয়ে আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। এসে পড়ল সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বৈঠকের মধ্যে, হোস্টেলের কমন-রুমের নিয়ন্ত্রণ-কমিটির সদস্যা হোল; এই করে হোস্টেল আর কলেজের জীবনে বেশ ভালো করে জড়িয়ে পড়ল।...যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে বি-এর ছাত্রী, তখন ও কলেজ-ইউনিয়নের সহকারী সম্পাদিকা। কলেজ ম্যাগাজিনে ওর লেখাও বেরুতে লাগল মাঝে মাঝে, চারিদিক দিয়েই ওর বেশ একটি প্রতিষ্ঠা গড়ে উঠল।

অচপল, দৃঢ় পদক্ষেপে একভাবে চলে এসেছে। মিলেছে, মিশেছে, কিন্তু একটি সীমারেখা বরাবর অলঙ্ঘিত রেখে গেছে। অনেক আগেকার কথা, মাস পাঁচ-ছয় তখন এসেছে। একটি প্রীতিভোজ ছিল হোস্টেলে। মেয়ে হিসাবে রান্নার দিকে নিজের জায়গাটি নিয়ে বসেছে অরুণা, তারপর পরিবেশনের দিকেও। যেমন হয়, একজন মেয়েছেলে মাঝে রয়েছে বলে অনেকখানি সংযত হলেও ছেলেদের মধ্যে আনন্দ-উচ্ছলতাটা ভেঙে পড়ছেই মাঝে মাঝে। অরুণা পরিবেশন তদারক করে বেড়াচ্ছিল, একটি ছেলে আর উৎসাহ চাপতে না পেরে বলে উঠল—"এবারের আমাদের এটা যে কী সাক্সেসফুল কি বলব! এবার থেকে আমরাও আপনাকে রুণাদিই..."

রুণাও খানিকটা হাস্য-চপলই হয়ে উঠেছিল, একজনের গেলাসে জল ঢালতে যাচ্ছিল, সোজা হয়ে উঠল। মুখটা গম্ভীর হয়ে গেছে,

বলল—"ওটা আমাদের নিজেদের মধ্যেকার ব্যাপার কিন্তু..."

একটা থমথমে ভাব সব মুখরতা অনেকক্ষণ চেপে রাখল সেদিন।

ছেলেটি বলেছিল ভালো জেনেই, শ্রদ্ধার সঙ্গেই, শুনতে বোধ হয় একটু চপল হয়ে গিয়ে থাকবে, সমস্ত হোস্টেল কিন্তু এর পর থেকে সীমারেখাটা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে রইল।

তবুও একজনের কথা থাকেই বাকি, সে-একজন মণীশ।

এ ক'টা বছর ধরে দুজনে দুজনের এক রকম নিত্যসাথী। এখানে তো বটেই, আর সবাই দূরে দূরে ব'লে দুজনে আরও কাছাকাছিই, অরুণাদের বাড়ি যাওয়াও অরুণাদের মতোই নিয়মিত হয়ে উঠেছে মণীশের। সে এখন ওদেরই একজন।

সব সময় অচলনাথ থাকেনও না, অরুণার সঙ্গী মণীশ, মণীশের সঙ্গিনী অরুণা। দীর্ঘ তিন বৎসরের ইতিহাস।

কিছু কি এসে পড়েছিল কখনও? দু দিকের বাহ্যিক ঔদাসীন্য ঠেলে, মাঝখানে "দিদি" শব্দটার কৃত্রিমতা ঠেলে?

স্পষ্ট কিছু বোঝা গেল না। অন্তত স্পষ্ট করে কিছু ফুটে ওঠবার আগেই মাঝখানে মালা এসে দাঁড়াল।

৮

এম-এ পরীক্ষার কাছাকাছি এসে মণীশের স্বাস্থ্যটা একটু ভেঙে পড়ায় দেওঘরে এক আত্মীয়ের কাছে চলে গিয়েছিল, শরীরটাও ঠিক থাকে, নিরিবিলিতে পড়াশুনারও সুবিধা হয়। ফিরে এল একেবারে পরীক্ষার সময়। তাতেও কিছু দিন গেল, চুকে গেলে যখন অরুণাদের গ্রামে গেল তখন সব মিলিয়ে প্রায় মাস তিনেকের একটা বিরতি গেছে।

সেই মালাকে প্রথম দেখল।

এতদিন ভুলে ছিল আসে নি; প্রশ্ন, অনুযোগ, অভিযোগ নিয়ে সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ খানিকটা দূরে থামের আড়ালে একটি নূতন মুখ দেখে মণীশের দৃষ্টিটা ক্ষণেকের জন্য আটকে গেল। ছেলেমেয়েরা ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে বলে উঠল—"ও হচ্ছে মালা দিদি।…মালাদি, এসো-না, মণীশদা তো…"

দু তিনজন এগিয়েও গেল ধরে নিয়ে আসতে। মালা অবশ্য একেবারেই থামের আড়ালে গুটিয়ে পড়ল।

সন্ধ্যার পর নূতন-পুরানোর আলোচনা প্রসঙ্গে জ্যাঠাইমা বললেন—"এর মধ্যে ঐ একটি পরের মেয়ে ঘাড়ে এসে পড়েছে বাবা, একেবারে ছেলেমানুষটিও নয়, কী যে করব মাথায় আসছে না। নজরে পড়েছে বোধ হয়?"

মণীশ বলল—"হ্যাঁ, দেখলুম তখন, আগে তো দেখি নি এখানে।"

কাহিনীটা শুনল মণীশ।

অনেক আগে—সেই মহাপ্রভুর আমল থেকেই এই সময়টা শ্রীক্ষেত্রের রথ উপলক্ষে গ্রামের সরকারী বড় রাস্তাটা দিয়ে তীর্থযাত্রীদের চলাচল হয়। গাড়ি হওয়ায় এখন আর তেমন ভিড় থাকে না। তবু নদীয়া, শান্তিপুর, বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চল থেকে যাত্রীরা, যারা বোধ হয় নিঃস্ব, বা পায়ে হেঁটে তীর্থযাত্রাই সার্থক বলে মনে করে, একা একা বা ছোট ছোট দল বেঁধে যায় এ-পথে; বেশীর ভাগই বৈরাগী বোষ্টম। একদিন সন্ধ্যার একটু আগে হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছে, একজন প্রৌঢ় প্রায়-বৃদ্ধ বোষ্টম এসে রাত্রিটার জন্য আশ্রয় চাইল, সঙ্গে একটি চৌদ্দ-পনের বছরের কুমারী মেয়ে; এই মালা। ওর পুরো নামটা হচ্ছে বনমালা। সদর ঘরে রইল দুজনে, ভোর হতেই আবার চলে যাবে।

সময়টা খারাপ, আশেপাশের গ্রামগুলো তখন একটু একটু বিগড়েছে, রাত্রেই বৈরাগীকে কলেরায় ধরল। চেষ্টা করা হোল

যথাসাধ্য, কিন্তু বাঁচানো গেল না, পরের দিন বিকালেই মারা গেল।

মণীশ সহজ সহানুভূতিতেই বলল—"মারা গেল! আহা!"

জ্যাঠাইমা বললেন—"বলতে নেই, কারুর মারা যাওয়াটাই খারাপ, আমরাও তার মারা যাওয়ার জন্যেই এই বিপাকে পড়েছি, কিন্তু একদিক দিয়ে ভালোই হোল বাবা, মেয়েটা বেঁচে গেল।"

"তার মানে!"—বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করল মণীশ।

"আমাদের বলেছিল মেয়েটি নাতনী, কিন্তু মারা গেলে মালার কাছে টের পাওয়া গেল, কেউই হ'ত না। গাঁয়েরই লোক, বোষ্টম, গাঁয়ে এই রোগের মড়ক হতে মালার বাপ-মা একটি বড় ভাই মারা যেতে যখন একেবারে অনাথা হয়ে পড়ে, এই-ই ওকে আশ্রয় দেয়। বছর নয়েক আগেকার কথা, সেই থেকে পুষেছে, পালন করেছে, নিজের সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়েছে।

"মালার কথায় যেমন বুঝলুম লোক যে খারাপ ছিল এমন নয়, ওর বাপ মা ভাই অসুখে পড়তে করেছিলও অনেক, কিন্তু এদিকে এসে মেয়েটার বয়েস হতে একটু লোভে পড়ে যায়। এই সময় আর একটা ব্যাপার হোল, বুড়োর সেবাদাসীটি হঠাৎ মারা গেল।

"মালার বাপ-মা বোষ্টম ছিল না, আমাদেরই মতন গেরস্ত কায়স্থ পরিবার। সেবাদাসীটি মারা যেতে বুড়ো একদিন দীক্ষার ব্যবস্থা করে ওকে নিজের ধর্মে টেনে নিল। বছর খানেকের কথা, এর মধ্যে কিছু বলে নি, শুধু কোনখান থেকে ওর বিয়ের কথা উঠলে টেলে দিয়ে এসেছে, ছুতোনাতা করে। লোকটা মূলে খারাপ নয় তো, ছেলে-বেলা থেকে পুষেছে, একটা অন্যভাবও আছে, বোধ হয় মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে লেগে গেল বছরখানেক, তারপর এই শ্রীক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছিল, সেখানে রথ দেখে পুরুষোত্তমকে সাক্ষী রেখে কণ্ঠিবদল করবে।"

শ্বাস বন্ধ করে শুনছিল মণীশ, বলল—"সত্যিই বেঁচে গেল!"

"তা গেল বৈকি, কিন্তু আমরা এখন কি করি? মেয়েটি বড়

ভালো, এত মেলামেশায় ঘোরাফেরায় এ বয়েসে একটু চনমনে বাচাল হয়ে পড়ে ওদের জাতের মেয়েরা। সে-সব কিচ্ছু নেই। এই আড়াইটে মাস ধরে দেখছি তো, শান্ত, বুদ্ধিমতী, নিজের অবস্থাটা বোঝে। কিন্তু আমাদের পক্ষে একটা সমিস্যে হয়েই তো দেখা দিল বাবা?"

মণীশ চিন্তিতভাবেই বলল—"সমস্যা বৈকি।"

ওপরের বারান্দায় গল্প হচ্ছিল, ললিতমোহন বেড়িয়ে এসে উঠে এলেন, কানে গেছে কথাটা, এগিয়ে আসতে আসতে বললেন—"বৌমার সেই সমস্যার কথা তুলেছেন বুঝি?...আমার কথাটা তো শুনতে চাইবেন না।"

ভেতরে জামা-জুতা ছেড়ে চটি প'রে বাইরে এসে আরাম-কেদারাটায় বসলেন, বললেন—"আমি বলি, সমস্যা যাঁর তিনি কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছেন যে তোমার এত মাথাব্যথা?"

জ্যাঠাইমা সাক্ষী মানলেন মণীশকে—"তা বললে প্রবোধ মানে মন, বাবা? সংসারী মানুষ তো। বাঙালীর ঘরের মেয়েই একটা সমিস্যে, তার ওপর পরের মেয়ে। সমিস্যে নয়, বল? যতই বাড়বে ততই সমিস্যেও দিন দিন বেড়ে যাবে না?"

বেড়িয়ে এলেই ছোঁড়া চাকরটা তামাক সেজে নিয়ে যায়, ললিত-মোহন নলটা হাতে তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—"দিলেন বাড়তে?"

"ওমা, দিলেন না? কী যে বলেন কাকা!"—ডান হাতটা মুঠো করে কপালে ঠেকিয়ে দোষ খণ্ডন করে বললেন—"মাথায় থাকুন তিনি, কিন্তু সমিস্যে বাড়াতে কসুর করছেন?"

ধোঁয়া টানতে টানতে নলটা মুখ থেকে সরিয়ে একটু হেসে বললেন ললিতমোহন—"সমস্যা যার আসল, তার কাছে আর বাড়তে দিলেন কই? তোমাদের তো গা পেতে নেওয়া সমস্যা মা। কী সর্বনাশটা হতে যাচ্ছিল একটা জীবনে ভেবে দেখেছ?"

হঠাৎ একটা নিস্তব্ধতা এসে গেল, বেশ খানিকক্ষণ ধরেই। শুধু গড়গড়ার শব্দটা একটানা রইল জেগে। এক সময় একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেলে একটা যেন দুঃস্বপ্ন থেকেই হঠাৎ জেগে উঠলেন সাবিত্রীদেবী, মুঠোটি আবার আস্তে আস্তে কপালে গিয়ে উঠল, বললেন—"অপরাধ হয়ে পড়ে, সংসারী জীব আমরা, বুঝতে পারি না। দিলেন নাই তো বাড়তে। এখন দয়া করে আমাদের সমস্যাটুকুও দিন কাটিয়ে ভালোয় ভালোয়।"

ললিতমোহন এবার একটু জোরেই হেসে উঠলেন—"ভবী ভোলবার নয়; আবার সেই 'আমি' আর 'আমার'!"

রাত্রে রান্নাঘরের দরজার কাছে একটা মোড়ায় বসে বড় বৌদিদির সঙ্গে গল্প করছিল মণীশ। মালা ভাঁড়ার ঘর থেকে এক থালা ময়দা নিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। বড়বৌ অন্নপূর্ণা বলল—"চলে এস, মণীশঠাকুরপো বাড়িরই লোক। একটু পাশ দাও ঠাকুরপো।"

মণীশ মোড়াটা সরিয়ে নিতে ভেতরে গিয়ে থালা হাতে একটু জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েই রইল মালা। বড়বৌ বলল—"না হয় রেখেই যাও, আমিই মেখে নিচ্ছি, অবশ্য ঠাকুরপোর কাছে লজ্জা করা বেশী দিন চলবে না এ বাড়িতে।"

"আমিই মাখছি"—বলে মালা হেঁট হয়ে বসে ময়দার মাঝখানটা গর্ত করে আস্তে আস্তে জল ঢালতে লাগল।

বড়বৌ একটু চুপ করে থেকে বলল—"আমরা একটি রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছি ভাই, জান বোধ হয়?"

মণীশ একটু হাসল, নতমুখী মালার দিকে দৃষ্টিটাও গিয়ে পড়ল একবার। বড়বৌ বলল—"সব ভেবেই সারা, আর সবারই ভাবনা নিজের নিজের মতন করে। আমি বলি আমারও একটা আছে ভাবনা—কারুর থেকেই কমও নয়।"

একটু হাসি দিয়েই প্রশ্ন করল মণীশ।

বড়বৌ বলল—"আমার অতশত ভাববার কি আছে বল ভাই, পাহাড়ের আড়ালে আছি। আমার ভাবনা হচ্ছে—ঠাকুর যেমন,

কোথাও কিছু নেই, হাতে তুলে দিলেন, তেমনি আচমকা আবার সরিয়ে না নেন।”

মালাকে ঘিরে সবার সমস্যা, ষষ্ঠীচরণেরও। তবে তিনি মেটাবার বেশ একটা উপায় ঠাওরে নিয়েছেন এর মধ্যে।

মণীশের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গেই বললেন—“মেয়ে মাত্রই আর যখন আগেকার মতন সেভাবের সমস্যা থাকছে না, তখন মালাই বা থাকবে কেন? আমি ঠিক করে ফেলেছি, আরম্ভও করে দিয়েছি।”

পড়াতে আরম্ভ করে দিয়েছেন একটু একটু করে।

বললেন—“বেশ চালাক মেয়ে, মণীশ। ফাউণ্ডেশন মাত্র অক্ষর পরিচয় পর্যন্ত ছিল, এর মধ্যে কয়েকখানা বই শেষ করে ফেলেছে। পড়ুক না।…রুণা এর মধ্যেই গাইতে আরম্ভ করেছে বিয়ে-থা করবে না, পড়াশোনা নিয়েই থাকবে। নাও, দাদুর সমস্যা মিটল, মার সমস্যা মিটল, মেজকাকার, ভাইদের সমস্যা মিটল…”

প্রসঙ্গটাকে অবশ্য হাসির মধ্যে শেষ করবার জন্যই মণীশ বলল—“আরও বাড়লই না বড়দা?”

অরুণার সঙ্গে আলোচনা হওয়ার বিশেষ অবসর হয় নি বাড়িতে, সে এলে আজকাল গ্রামে পাঁচটা ব্যাপার নিয়েই বেশী মেতে থাকে।

গাড়িতে তুলল কথাটা—।

“হ্যাঁ, এবারে নতুন একজনের সঙ্গে পরিচয় হোল? মালার কথা বলছি।”

মণীশ বলল—“ঠিক পরিচয় হয়েছে বলা যায় না, তবে পেলুম সবার মুখে…”

“হবেও, দেখো, বড় চমৎকার মেয়েটি।”

এরপর অন্য কথা এসে পড়ল।

ভালবাসা অনেক পথ ধরেই আসে, কিন্তু করুণার পথ ধরে এলে তার শক্তি হয় সবচেয়ে অমোঘ।···সবচেয়ে অমোঘ আর প্রবল হয়তো রূপের পথ ধরে এলেই হয়। কিন্তু সে কি ভালবাসাই?

অরুণার সঙ্গে অত মেলা-মেশা করে তিন বছরে যা হয় নি—কিম্বা হয়তো নানা কারণে স্পষ্ট হতে পারে নি, মালার বিষয়ে সেটা তিন মাসও গেল না, নিঃসন্দেহ ভাবেই আত্মপ্রকাশ করে বসল।

শনিবারে-শনিবারে একবার করে গাঁয়ে আসা অরুণার একরকম বাঁধা। কতকগুলি মেয়ে নিয়ে একটা নৈশ বিদ্যালয় চালায়, সপ্তাহে দুই দিন—শনি আর রবি; সোমবার সকালের গাড়িতে ফিরে আসে। অচলনাথের অত নিয়মিত ভাবে হয়ে ওঠে না যাওয়া, তবে মণীশ একরকম নিত্যসঙ্গী; শুধু এদিকে পরীক্ষার প্রস্তুতির মধ্যে যা কমে গিয়েছিল।

এখন পরীক্ষা হয়ে যেতে আবার পূর্ব ব্যবস্থাটা ফিরে এল।

শুধু তাই নয়। পড়াশোনা নেই, তার ওপর অলস মনে পরীক্ষার ফলাফলের ভাবনাটা এসে চেপে চেপে বসে, সময় যেন আরও অচল অনড় হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যার পর পড়াতে এসে সেই কথাই বলছিল অরুণাকে—"একটা পরামর্শ দাও দিকিন, অষ্টপ্রহর নিজেকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে তো পারা যায় না আর।"

একটা অঙ্ক কষছিল মাথা নীচু করে, মুখ টিপে একটু হাসল অরুণা। একটু চুপ করেই থাকার পর বলল—"পরামর্শ···মানে, একটা কথা মনে করিয়ে দিতে পারি, কিন্তু···থাক্।"

"না, বল।"

একটু জিদ করে ধরতে বলল—"পরীক্ষার পর আবার দেওঘরে যাবে বলছিলে···"

"ও! সে ঠিক ভুলি নি, ছেড়ে দিয়েছি মতলবটা। বড্ড লোন্‌লি রুণাদি, বিশেষ করে ওঁরা যেদিকটা থাকেন।"

"বাঁচলুম।"—বলে মুখ তুলে নিশ্চিন্ত হয়ে হাসল অরুণা। "আমিও চেপে গিয়েছিলুম।"

অঙ্ক কষতে কষতে আবার একবার মুখ তুলে বলল—"করতে পারি আর একটা জায়গার নাম, কিন্তু সে তো আরও লোন্‌লি তোমার পক্ষে।...বাড়ির কথা বলছি।"

একটু থেমে কুণ্ঠিত ভাবে বলল—"চাও তো কাজও দিতে পারি —সময়টা ভরিয়ে রাখবার জন্যে।"

"কি কাজ?"

"আমার নাইট-ইস্কুলটা চালাতে..."

"মেয়েদের স্কুল তো।"

"আমার স্কুলের কারিকুলামে ওটাও রেখেছি—পুরুষদের কাছে পড়তে সঙ্কোচ নেই তাদের। বড়দাকে নিয়ে যাই মাঝে মাঝে, নিজে ছাত্রী হয়ে বসি।"

"বড়দার বয়স হয়েছে—খুব বেশী না হোক।"

"কম বয়সেরও অভ্যেস করাচ্ছি। দাদা ওঁদের স্কুলের পরিতোষ-বাবুকে বলেছেন, আমারই অনুরোধে। নতুন পাশ করেছেন। দু বার এসে গেছেন এর মধ্যে। হপ্তায় দু দিন থেকে চার দিন হয়েছে আমার।" একটু আবার হেসে বলল—"বাকি থাকে বোধ হয় তোমাদের দিকটা..."

"তার মানে?"

একটু হেসেই বলল অরুণা—"সঙ্কোচটা কাদের বেশী বলা শক্ত; হোস্টেলে এসে দেখলুম তো। তা আমার মেয়েরা কেউ তেরো-চোদ্দ বছরের বেশী হবে না।"

মণীশ হেসেই জবাব দিল—"আমার সম্বন্ধে ওটা তুমি ধরে নিয়েছ রুণাদি। থাক্ সে কথা। প্রস্তাবটা তোমার ভেবে দেখবার মতন। কাজের কথাটা বাদ দিলেও তোমাদের বাড়ি বা গ্রাম আমার

কখনই লোন্‌লি মনে হয় নি, হবেও না বোধ হয়, সবাই রয়েছেন। কিন্তু এদিকে তোমার ক্ষতি হবে যে, মেজ-জ্যাঠামশাই আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি আছেন।"

কথাটা দ্বিতীয়বার উঠল গ্রামে গিয়েই। ঠিক ওভাবে ওঠাল না কিন্তু অরুণা। একেবারেই স্কুলে বেরুবার সময় এসে মণীশকে ধরে পড়ল—"চল আমার স্কুলে, আজ তোমারই পালা, ঠিক করেছি।"

মণীশ থতমত খেয়ে চাইতে, বলল—"হ্যাঁ, চল।"

একটু গিয়েই বড় রাস্তার ওপর মেয়েদের ছোট স্কুলটার দুটি ঘর। এরই একটিতে নৈশ পাঠশালা বসে—স্কুলে যায় না এইরকম গুটি-তিরিশেক মেয়ে নিয়ে। তারা আগে থাকতে এসে গোটা-তিন শতরঞ্জি পেতে বসেছিল, অরুণা মণীশকে নিয়ে উপস্থিত হোল।

ছোট ছোট ভাগে চারটি ক্লাস করা। ওপরের দুটি মণীশের হাতে দিয়ে, নীচের দুটি নিজে নিল অরুণা। পড়ানোর পর সেলাই আর বোনার কাজ, সেটা অবশ্য অরুণা নিজেই দেখল। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল সব মিলিয়ে। মেয়েরা ছোটবড় দল করে নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

দুজনে চুপ করে আসছিল, সামনে ছোঁড়া চাকরটা একটা লালঠেন নিয়ে এগিয়ে চলেছে; অরুণা প্রশ্ন করল—"কেমন লাগল?"

উত্তর হোল—"মন্দ কী? ভালোই। আরও ভালোই লাগবে হয়তো, একটু ইন্টারেস্ট জমে গেলে।"

"তাহলে? আসবে?"

"তোমার ক্ষতি হবে কিন্তু। এটা আবার পরীক্ষার বছর তো।"

একটু চুপ করে রইল অরুণা, তারপর একটু চিন্তিত ভাবে বলল —"তা হবে একটু। আচ্ছা, একটা রফা করা যাক—সময়টা আধা-আধি ভাগ করে দাও তোমার,—এখানে আর কলকাতায়। প্রায়ই হপ্তায় দুটো রাত কাটে তোমার এখানে। আর দুটো রাত দাও।"

একটু ভাবল মণীশ, বলল—"আর একটু রক্ষা করা যাক তাহলে। ছুটো নয়, এখানে আর একটা দিন দেওয়া যাক, রাতই বলি—সোমবারটা থেকে যাই তোমার সঙ্গে শনিবার এসে। কলকাতায় তোমার জন্যে রইল—মঙ্গল বুধ বেরস্পতি শুক্কুর। আমার একঘেয়েমিটাও নষ্ট হয়, আর…"

"আমার দেওয়া দায়িত্বটা নিতে চাইছ না ভালো করে।"—একটু অনুযোগের সুরেই বলল অরুণা।

মণীশ হেসে জবাব দিল—"জ্যাঠামশাইয়ের দেওয়া দায়িত্বের সম্মানটা বেশী তো।"

"যাকে নিয়ে দায়িত্ব সে যখন মকুফ করতে চাইছে…"

"বেকুফি করেই তো? …"

অল্প পথ, হাসির মধ্যেই আলোচনাটুকু শেষ হয়ে গেল।

রবিবারও অরুণা নিয়ে গেল মণীশকে সঙ্গে করে। নূতন ব্যবস্থাটা জানিয়ে দিল ছাত্রীদের।

সোমবার সকালে একাই কলকাতা ফিরে গেল।

ষষ্ঠীচরণ স্কুল থেকে এসে মণীশকে দেখে প্রশ্ন করলেন—"তুমি গেলে না ফিরে মণীশ?"

মণীশ জানাল কারণটা। হালকা করে দিয়েই বলল—"গোপাল ভাঁড়ের সেই 'কেষ্টার ব্যাগার খাটা'র গল্পটা জানেন তো? আমি রুণাদির ব্যাগার খাটছি। ওর নাইট-স্কুলের জন্য ধরেছে আমায়, একটা দিন দিতে হবে।"

ঘরে যাচ্ছিলেন জামা-কাপড় ছাড়তে, দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—"রুণাদি তো বেশ আগেভাগে বাগিয়ে নিলে তোমায়। আমিও ধরব ভাবছিলুম—ব্যাগারই, তবে অতটা নয়। ভাবছিলুম তোমার সময় হবে কিনা।"

"বলুন না। সময় নিয়ে করব কি—পরামর্শ চাইতে গিয়েই তো এই ধরা পড়ে গেছি।"

"ভেতরে এস তা হলে।"

বললেন—"মালাকে পড়াবার কথা বলেছিলুম না তোমায়? Flotsam of Fate—অদৃষ্ট-নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছে, কিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিলে ওর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তোমায় একদিন বলেছিলুম—আরম্ভ করে দিয়েছি, প্রগ্রেস ভাল, কিন্তু সে রকম সময় তো দিতে পারছি না আমি। রাত্তিরে একটু নিয়ে বসি। তাই বলছিলুম—তোমার অবসর রয়েছে, দিনকতক একটা ঝোঁকে যদি খানিকটা এগিয়ে দিতে পার। মাইনার স্কুলটা হওয়ার কথা হচ্ছে, একবার একটু উঁচু ক্লাসে ভর্তি করে দিতে পারলে—ধাঁ ধাঁ করে এগিয়ে যাবে। পারবে দিন কতক দিতে, তোমার রেজাল্ট না বের হওয়া পর্যন্ত? থাকতে হয় কিন্তু তাহলে এখানে এসে।"

"সেটা কিছু নয় বড়দা, রুণাদিকে বলছিলুমই বাইরে কোথাও গিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। এখানে হলে তো ভালোই। কিন্তু ওর ক্ষতি হবে, এটা পরীক্ষার বছর তো।"

"সেও একটা ভাববার কথা বৈকি, ওদিকটা অ্যাটেন্‌শন্ যায় নি আমার।…তাহলে?"

"আমি শনিবার আসি, রবি, সোম—এই তিনটে দিন তো হাতে আছে। বেশ করে যদি ওকে নিয়েই পড়া যায়, ইস্কুলের সময়টুকু বাদ দিয়ে…"

"সেইখানে একটু অসুবিধে আছে। বুদ্ধিমতী, কিন্তু বড় অমনোযোগী মেয়েটা, চঞ্চল বললেও ভুল হয় না।"

হেসে বললেন—"এক নাগাড়ে ছড়ি ধরে বসে পড়ানোর মতন মেয়ে, কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়।"

একটু চিন্তা করে বললেন—"বেশ, এক কাজ কর। আজ ওকে তুমিই নিয়ে ব'স; একটা আন্দাজ করে নাও, তারপর পরামর্শ করা যাবে আবার। আমি রুণাদির ব্যাপারটা খেটে দোব'খন।"

যোগাযোগ এমন হোল যে পুরো সপ্তাহটাই থেকে যেতে হোল মণীশকে।

পড়তে আসতে বেশ একটু গড়িমসি করে মালা। আলস্যেও নয়, মিথ্যা ছুতানাতা করেও নয়, সংসারের ছোটখাট কাজ সে অনেকগুলিই নিজের হাতে তুলে নিয়েছে, সন্ধ্যার সময়টা থাকেও বেশী। ষষ্ঠীচরণ তাগাদা দেন, বিশেষ ফল হয় না, "এলুম বড়দা··· এই যে এলুম" বলে টেনে নিয়ে যায়।

মালার সঙ্গে পরিচয়টা বেশ সহজ হয়ে এসেছে মণীশের, প্রথম দেখা হওয়ার পর কয়েকবারই তো এল। তবু, প্রথম দিন বসে পড়ানো, বেশী তাগাদা দিয়ে ডাকিয়ে আনতে পারছিল না। বারান্দার একদিকে ললিতমোহনের ঘর, সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই ; অন্য প্রান্তে ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘরের সামনে মালার পড়বার টেবিল। সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে এসে ঘরে যেতে যেতে বলল—"বড়বৌদি, মালাকে পাঠিয়ে দাও, আজ বড়দা রুণাদির ইস্কুলে গেছেন, আমাকেই পড়াতে বললেন।"

মালাই উত্তর দিল, হাতে একটা কি কাজ ছিল, বলল—"চলুন, এটুকু সেরে নিয়ে আসছি।"

বইগুলা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল মণীশ, বেশ খানিকটা দেরি করে উঠে এল মালা, একটু ত্রস্তভাবেই। একটু লজ্জিতভাবে হেসে বলল—"বড়দা হলে এর মধ্যে কতবার যে তাগাদা দিতেন—হাতের কাজটুকু সেরে আসতে দেন না।"

মণীশ বলল—"তা বলে আমায় কম কড়া মাস্টার ভেবো না যেন।"

বেশী উত্তর দেয় না। অল্প কথার ঘায়েই যেন লজ্জিত হয়ে নুয়ে পড়ে। ওর স্বভাবটা সব কিছু মেনে নেওয়ার। তার জন্যে একটা মৃদু হাসি সব সময় লেগেই থাকে ঠোঁটের কোণে।

বইগুলো গুছিয়ে নিয়ে মাথা নীচু করে একটা খুলতে যাবে, এমন সময় টম নীচে ডাক দিয়ে উঠল।

ওদিক থেকে আওয়াজ হোল—"আমরা রে, টম!"

অচলনাথের গলা। দুজনে যেমন ছিল একটু চকিত হয়ে সদরের দিকে ফিরে চাইল। ললিতমোহন বারান্দায় আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন, গড়গড়ার শব্দ থেমে গেল। মণীশ গিয়ে বারান্দার রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়াল, মালাও উঠল।

সাবিত্রী দেবী, বড়বৌ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। অচলনাথের সঙ্গে অরুণা, গায়ে একটা র‍্যাপার জড়ানো।

অসুস্থ হয়ে পড়েছে অরুণা। অচলনাথ বলছেন—"কলেজ থেকে এসে দেখি মুখখানা থমথমে হয়ে রয়েছে, কপালে হাত দিয়ে দেখি তাপও রয়েছে মন্দ নয়, থার্মোমিটারেও প্রায় এক-শ উঠল। জ্বর-জারি হচ্ছে চারিদিকে, টাইফয়েডেও গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, ভাবলুম রেখেই আসি।"

উনি সকালের গাড়িতেই চলে গেলেন।

অরুণার অসুখটা সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জাই। বাড়াবাড়ির দিকে গেল না, দিন তিনেকের মধ্যে সেরেও গেল, তবে, যেমন হয়ে থাকে, খুব দুর্বল করে দিয়ে গেল।

মণীশ রয়ে গেল।

অসুখ-বিসুখে যে দুর্বলতাটা এসে পড়ে, তাতে মানুষে প্রিয়জনের মন খোঁজে। তবে অযথাই এক ধরনের অভিমানের মতো এসে যায় যেন এ সময়টা—সোজাসুজি বলতে চায় না কিছু। অরুণা বলত—"কী আর এমন হয়েছে? নিজে তো বুঝছি সাধারণ সর্দি-জ্বর, তুমি বাড়ি যাও মণীশ, ক'দিন থাকবে? ব'লে আস নি।"

যখন একটু ভালো হয়ে উঠল, পথ্য পেল, বলল—"তুমি না হয় থেকেই যাও, মালার পড়ার ক্ষতি হয়ে গেল তো, মেক-আপ করে দিয়ে যাও। একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

রয়েই গেল মণীশ। তবে তাতে মালার পড়ার যে বিশেষ সুবিধা হোল এমন নয়।

পড়তে বসতেই সেই যে বাধা পড়ে গেল, জ্বর-গায়ে অরুণা এসে ঘরে ঢুকল, তারপর থেকেই ও বরাবর তারই পাশে। ঔষধপত্র খাওয়ানো, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া; ঘুমিয়ে থাকলেও ঘুরে ঘুরে পায়ের কাছটিতে চুপটি করে এসে বসে থাকে, কেউ যদি এসে গেল ঘরে, ঘুমন্ত হলেও পায়ে হাত বুলোতে শুরু করে দেয়।··· চোখে সদাই যেন একটা চিন্তার ভাব লেগে থাকে, কতকটা যেন আতঙ্কেরই।

জ্বর সেরে যাওয়ার পরও ওর এ অভ্যেসটা গেল না। একদিন দুর্বলতার জন্য নিঝুম হয়ে পড়ে থাকবার পর দেখেও ফেলল অরুণা। তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ সেটা ভেঙে গিয়ে দেখে মালা কখন এসে পায়ের কাছটিতে বসে আছে। ওকে জেগে উঠতে দেখে অপ্রতিভ হয়ে হাতটা পায়ের ওপর বাড়িয়ে দিল।

অরুণা একটু হেসে ঠাট্টা করে বলল—"কি রে, যমে ছেড়ে দিলে, তবু যে তুই ছাড়তে চাস না!"

হঠাৎ যেন একটা স্নেহের জোয়ার উঠে এল বুক বেয়ে—"এদিকে আয় তো"—বলে কোলের কাছে টেনে নিল। ওকে জড়িয়ে একটু চুপ করে পড়েই রইল, তারপর বলল—"বড্ড সেবা করেছিস আমার অসুখে মালা, কিছু একটা চা।"

মালা নিরুত্তরই রইল। ওর নরম আতপ্ত দেহের স্পর্শটা নিজের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা মিষ্ট উত্তাপের সঞ্চার করছে, অরুণা ওকে আর একটু টেনে নিল কোলের কাছে, প্রশ্ন করল—"কই, কিছু চাইলি নি তো?"

"কি চাইব রুণাদি? সবই তো···"

"চুপ কর্ মালা"—মুঠার একটা চাপ দিয়ে থামিয়ে দিল অরুণা। "তোর মুখে আর সবই মানায়, শুধু পাকামিটা একেবারেই মানায় না। কেন, কিছু একটা চাইতে পারিস না? কলকাতায় রয়েছি,

হপ্তায় একবার করে আসছি, যার যা দরকার বলছে।···সবই রয়েছে বলছিস—সে যেমন আর সবার সব রয়েছে তেমনি হয়তো তোরও আছে—পাঁচখানা শাড়ি, গোটাকতক ব্লাউস, সাবান, মাথার কাঁটা, চুলের ফিতে—এ সবকে তো থাকা বলা যায় না। তোর নিজের সাধ-আহ্লাদের কিছু নেই?" বলতে বলতে একটু উচ্ছ্বসিতই হয়ে উঠল অরুণা—"বেশ, না থাকে সাধ-আহ্লাদ নিজের কোনও, আমার সাধ-আহ্লাদেই চাইবি। হয় না সাধ আমার? একটি বোন এনে দিয়েছেন ভগবান—দিদি বলে একটু ফরমাশ করলি—সাধই তো আমার একটা—তা এতদিন এসেছিস···"

ডান হাতটা ওর কোলে ছিল, এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু টপ করে পড়ল। অরুণা ওর মুখটা হাতে ঘুরিয়ে নিয়ে বিস্মিত হয়ে বলল—"একি রে, তুই কাঁদছিস মালা! ছ্যাখো, এত ছেলেমানুষ, ওদিকে মুখে পাকা পাকা কথা!"

আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে দিল। বলল—"কাঁদবার কি আছে বল্ তো আমায়। বড় বোন জেনে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে সেবা করবি, অথচ বড় বোন হয়ে আমি যদি একটু···ছ্যাখো, আবার কাঁদে। কাঁদবার কি আছে এত!···"

অশ্রু বেড়েই যাচ্ছে দেখে চুপ করে গিয়ে আস্তে আস্তে চোখ দুটো মুছে দিতে লাগল; নিজের মনটাও হঠাৎ উদ্বেল হয়ে উঠেছে, সাহস পাচ্ছে না কথা বলতে।

একটু সময় গেল সামলে নিতে। না, ওভাবে চলবে না, অশ্রুই টেনে আনবে তাতে।·· মালার যদি কাঁদবার কিছু না থাকে তো আছে কার?

সুরটা বদলে দিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে আদেশের টোনে বলল—"না, কাঁদে না মালা, ছিঃ, আমি এই হুকুম করছি, কাঁদবি নি, শুনবি তো হুকুম?···দেখি মুখখানা।"

খানিকটা ঝরে গেছে অশ্রু, তা ভিন্ন, কান্না পেলে না-কাঁদবার হুকুমে বোধ হয় একটা অসঙ্গতিও আছে, লজ্জা এসে পড়েও মনটা

খানিকটা ঘুরিয়ে দিয়েছে, মুখটা ঘুরিয়ে নিতেই এক কণা অপ্রতিভ হাসি ফুটে উঠল মালার ঠোঁটে। হাতটা না ছেড়েই অরুণা বলল—"এই তো, কাঁদতে যাবি কেন কথায় কথায়?…আর এই তো বেশ হুকুম শোনবার মেয়ে—শোন্, একটা কিছু চা দিদির কাছে। চাইবি তো?"

একটু হেসে মুখটা ঘুরিয়ে নিল মালা। অরুণা তাগাদা দিতে সেই ভাবেই আস্তে আস্তে বলল—"চাইব দরকার পড়লে…"

অরুণা দুষ্টুমি করে শিউরে উঠল, আবার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে বলল—"দ্যাখো! মিটমিটে ডাইন! আজ নয়, দরকার পড়লে উনি কৈকেয়ীর মতন তাক্ বুঝে চেয়ে আমার সর্বনাশ করবেন।…পোড়ারমুখি, দশরথের মতন সবাইকে বুঝি গবেট ভেবেছিস? তাহলে আমিও বলে দিই…"

১১

কথাটা হাসিতে শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ একটা তীব্র আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে গেল অরুণা। এক এক সময় নিগূঢ় অর্থ নিয়েই যে বেরিয়ে পড়ে কোন কোন শব্দ।

"কৈকেয়ীর মতন তাক্ বুঝে…সর্বনাশ করবেন।"

—কথাগুলা যেন আর শব্দমাত্র নয়, মূর্তি নিয়ে হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, অরুণার মনটা দীপের চারিদিকে পতঙ্গের মতো সে-মূর্তিকে আবর্ত করে ঘুরতে লাগল। হাত মালার কোলে এলিয়ে পড়েছে, সমস্ত শরীরটাই হঠাৎ হয়ে পড়েছে শিথিল। সামনে দেয়ালের ওপর দৃষ্টি ফেলে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল।

হাসির মধ্যেই সংকুচিত হয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিল মালা, ফিরে দেখে শঙ্কিত হয়েই প্রশ্ন করল—"কি হোল রুণাদি! খারাপ বোধ হচ্ছে শরীর?"

ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বসল।

"পাখা করব?…জল খাবে?"

অরুণা বলল—"কিছু হয় নি…তেমন কিছু নয়…"

"তবে? অমন করে যে…কাউকে ডাকব?"

অরুণা ক্লান্তভাবে বলল—"বলছি তো কিছু হয় নি। না, কাউকে ডাকতে হবে না। তুইও বরং যা একটু…"

মালাকে বিমূঢ়ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে একটু অসহিষ্ণু ভাবেই আরম্ভ করল—"যা না, বলছি…"

নিজেকে সংযত করে নিয়ে স্বরটা নরম করে পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে বলল—"যা বলছি, লক্ষ্মী দিদিটি,—অষ্টপহর রোগীর কাছে বসে থাকা ভালোও নয় তো—ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগটা আবার ছোঁয়াচেও। আমার হয় নি কিছুই, সত্যি বলছি। এক এক সময় যেমন ইচ্ছে করে না?—চুপটি করে পড়েই থাকি—অসুখের পর আবার বেশীই হয়—সেইরকম মনে হচ্ছে। একটু যা, আবার আমি ডেকে নোব এখুনি।"

মালা আস্তে আস্তে নেমে গেল। একা চুপ করে পড়ে ভাবতে লাগল অরুণা—

সর্বনাশটা কি আরম্ভই হয়ে যায় নি? কৈকেয়ী সুযোগ বুঝে বর চেয়ে ডেকে এনেছিলেন, মালা কি নিজের সঙ্গে করেই নিয়ে আসে নি অরুণার সর্বনাশ?

অনেকগুলো প্রশ্ন, যা এ-ভাবে মনে হয় নি আগে, এই বড় প্রশ্নটার উত্তর হয়ে দেখা দিতে লাগল।

মণীশ আজকাল এখানে আসবার সুযোগ যেন বেশী করে খোঁজে,—কেন? শুধু কি পরীক্ষা দিয়ে এখন সে মুক্ত বলেই? অরুণা অসুস্থ হয়ে পড়েছে—কাজ নেই, ব'লেও আসে নি মণীশ, যেতে বলল—গেল না। সুস্থ হয়ে উঠে থাকতে বলল, যেন বর্তে গেল মণীশ; মালাকে পড়াতে হবে!…পরীক্ষা-মুক্ত ঢালা অবসর, তবু

গেলই না দেওঘরে। লোন্‌লি! অথচ সেখান থেকে ফিরে ঐ লোন্‌লিনেসেরই কী প্রশংসাটাই না করেছিল ঐ মণীশই!...

কেন? কেন এসব?

"কিন্তু তোমারই বা কেন এত প্রশ্ন? কিসের এমন সর্বনাশ তোমার?"

—নিজের মনের দিক থেকেও এ প্রশ্নটা এত স্পষ্ট করে কখনও আসে নি এই দীর্ঘ তিন বৎসরে। একটা উত্তর বোধ হয় দেওয়া যায়, কিন্তু এতই সশঙ্ক যে নিজের কাছে নিজেই উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছে না।...কৈ, এ-তত্ত্ব তো জানে নি কখনও এতদিন। বায়ুর মতো সহজ ছিল বলেই কি?—আজ আলোড়নে হিল্লোল তুলে উঠল মনের মধ্যে?

যা এসেছিল দুজনের মধ্যে কোনও একদিন—এই তিন বৎসরের নিবিড় সান্নিধ্যে, নিতান্তই অজ্ঞাতসারে—একেবার হারাবার মুখে তা নিজেকে স্পষ্ট করে দিল কি?

বড় অসহায় বোধ হচ্ছে। দুর্বলতার জন্যে বুকের ভেতর একটু সে ধুক-ধুক শব্দ উঠেছে, নিজের দুঃসহ চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেটুকুর দিকে কান পেতে রইল অরুণা। ক্রমে সব প্রশ্ন ঠেলে সরিয়ে একটি প্রশ্ন নূতনভাবে যেন সামনে এসে দাঁড়াল—কেন এভাবে হঠাৎ আসতে গেল মালা ওর জীবনে?...

মনটা কি কঠিন হয়ে উঠছে অরুণার? ঠিক বুঝতে পারছে না —তবে এ-ধরনের অনুভূতি এর আগে আসে নি কখনও—একজনের ওপর একটা অশুচি ঘৃণার ভাব যেন। পুষ্টই করতে ইচ্ছা করছে ঘৃণাটুকুকে, ভালোই লাগছে; কিন্তু ভালো-লাগার মধ্যে এ যেন আরও অস্বস্তিকর। বড়ই অসহায় বোধ হচ্ছে।

বাইরে বিকালটা ধীরে ধীরে মলিন হয়ে এল অরুণার গবাক্ষ-বদ্ধ দৃষ্টির সামনে। ধীরে ধীরে ঝিঁঝিঁর সমতান জেগে উঠল আগাছার জঙ্গলে।...সন্ধ্যা নেমে এল।

তুলসী-তলায় প্রদীপ দেওয়ার আগে সেটিকে একবার সব ঘরে

দেখিয়ে দেওয়ার রীতি আছে এ-বাড়িতে। আজকাল মালা-ই করে এ-কাজটুকু, একটু কুণ্ঠিত চরণে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল, তারপর বিছানাটার দিকে একবার সন্তর্পণে চেয়ে নিয়ে নিঃশব্দে প্রবেশ করল। অরুণা মাথাটা পাশবালিসে সংলগ্ন করে শুয়ে ছিল, সেই ভাবেই রইল শুয়ে, চোখ দুটো একটু বুজেও নিল বরং। মালা ঘরের ভেতরের দিকে চলে গেলে আস্তে আস্তে আবার খুলল।

বেশ নূতনভাবে প্রদীপটি দেখায় ঘরে মালা, তাইতেই আরও জ্যাঠাইমা ওর হাতে এ-কাজটি তুলে দিয়েছেন।···গলায় আঁচল জড়ানো, বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কনুইটি ছোঁওয়া, দীপটি ধ'রে ঘরটি যেন মন্দিরের মতোই পরিক্রমা করছে, যেখানে ঠাকুরের পট সেখানে হাতটা একটু তুলে ধ'রে আরতির মতো দুলিয়ে আনছে। নিজের মুখেও আলো-ছায়া দোল খাচ্ছে সেই সঙ্গে। দেখতে লাগল অরুণা।·· এ আবার কী এক নূতন অনুভূতি সেই মনেই। কত যেন করুণ, কত যেন শুচি-স্নিগ্ধ! সেই মনেই কী একটা সঙ্কল্প, কী একটা স্বস্তি। যা কিছু উঠেছিল ভেসে, সব কিছু সরিয়ে ঠেলে একটা মৌন সমবেদনায় মনটা ভরে দিয়েছে—আহা, ওর কি দোষ? কত অসহায় ও!

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ডাকল—"মালা শোন্।"

মালা একটু চকিত হয়েই ঘুরে দাঁড়াল, প্রশ্ন করল, "ঘুমুচ্ছিলে না রুণাদি?"

সামান্য হলেও মিথ্যাকথাটুকু মুখে আটকে গেল অরুণার, বলল —"পড়ে ছিলুম। আয় একটু এদিকে, পিদিমটা রেখে দে টেবিলে।"

দ্বিধা কাটাতে দু'চার সেকেণ্ড গেল, কিছু বলল না কিন্তু অরুণা। প্রদীপটা রেখে কাছে এসে দাঁড়াতে বলল—"উঠে বোস্ একটু।"

বসলে আগেকার মতো জড়িয়ে ধ'রে প্রশ্ন করল—"কই, এলি নি যে?"

"মনে করলুম···"

"ঘুমুচ্ছি, না ?...তা নয়, আমি বলব ? ডাকি নি বলে অভিমান, নয় ?"

চুপ করে রইল মালা।

"আমিও যদি বলি—আসছিস না দেখে অভিমান করেই আর ডাকলুম না ?"

চুপ করেই রইল।

"একটু কড়া হয়ে পড়েছিল দিদি, না রে ?"

"কই ! বাঃ !" চেষ্টা করে যতটা বিস্মিত হওয়া যায় ও-অবস্থায় তা হোল মালা।

"কিছু মনে করিস নি, লক্ষ্মী বোনটি।"

আরও কিছু বলতে ইচ্ছে করছে, মন খুলে দিয়ে অনেক কথাই ; কিন্তু ভরসা পাচ্ছে না। চুপ করেই পড়ে রইল।

এক সময় মালা বলল—"আসছি রুণাদি তুলসীতলায় পিদিমটা রেখে। বসব..."

বসতে পারছে না নিশ্চয়, এখনও যে হাতে চোখের জলের ফোঁটা পড়ে নি এইটেই আশ্চর্য লাগছে অরুণার। হাতটা আলগা করে দিয়ে বলল—"না, এখন আর আসতে হবে না তোকে মালা।... যে কাজ তোকে দিয়েছেন তিনি, এই মন নিয়ে তাই কর্ গে, বরাবর করবি।"

মালা একটু বিমূঢ় হয়েই ঘুরে চাইল। অরুণা বলল—"ছাখো, বোকার মতন চেয়ে আছে! পথ থেকে নিয়ে এসে ঘরের কাজই তুলে দেন নি তিনি তোর হাতে ?...যা।"

মালা চলে যেতে সামনের পটের দিকে চেয়ে চুপ করে পড়ে রইল অনেকক্ষণ, তার পর উঠে প্রণাম করে আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল।

রবিবার কলকাতায় ফিরে যাবে, মাঝের দুটো দিন একটা চিন্তা নিয়ে কাটাল অরুণা, কিছু ঠিক করে উঠতে পারছে না; দু বার দু ভাবে তো আটকে রাখল মণীশকে, এবার কি বলে আটকাবে? ইচ্ছা থাকলেও মণীশ আর থাকতে চাইবে না, মনের অন্তস্তলে একটা খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার আরম্ভ হয়ে গেছে তো, চক্ষু-লজ্জায় পড়ে যেতে হবে বলেই থাকবে না।

তারপর একটা বুদ্ধি এল মাথায়। ষষ্ঠীচরণকে ধরল অরুণা। বলল—"বড়দা, মণীশকে বল না, দিনকতক থেকে গিয়ে মালাকে একটু এগিয়ে দেয়। ঢালা ছুটি আছে, তুমি আর কতটুকু পারবে? আমার কথা শুনবে না।"

"বলেছিলি?"

একটু থমকে গিয়ে বলল—"সে···বলাই একরকম। ওর ভেতরের ইচ্ছেটা আবার দেওঘরে ফিরে যায়। পরীক্ষার পর শরীরটা নাকি ভেঙে গেছে।"

মিথ্যাই বলল।

উত্তর হোল—"তা ফিরিয়েই নিয়ে আসুক না বরং স্বাস্থ্যটা, বেশ ভালো কাজই তো।"

"তুমি থাম তো। তার চেয়ে অনেক ভালো কাজ আছে জীবনে, স্বাস্থ্য যখন একেবারে ভেঙে পড়ে নি। আর তাই যদি বললে তো এখনাকার মাঠে, পুকুরে প্রচুর স্বাস্থ্য আছে—চায়ও তো ও। তুমি বল একটু।"

"তোরও তো ক্ষতি। অবসর রয়েছে, খানিকটা বেশী সময়ই দিতে পারত তোকে মণীশ।"

"আমার ক্ষতি আমি সামলে নিতে পারব, একটা সিস্টেমের মধ্যে রয়েছি তো। মেজো জ্যাঠামশাইও রয়েছেন। যার সামলাবার

উপায় নেই তাকে দেখা একটু উচিত নয়? শুধু উচিত কেন?—দরকারও তো আমাদের নিজের স্বার্থেই। চিরদিন তো বোঝা বইতে পারব না আমরা।”

চিন্তা করতে লাগলেন ষষ্ঠীচরণ।

অরুণা বলে চলল—“এই কথাই ভেবে তুমি আরম্ভও তো করেছ বড়দা, আমার ইচ্ছে ওকে তাড়াতাড়ি ইস্কুল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে উঁচু ক্লাসে ভর্তি করে দেওয়া। তাহলে ও-ও একটা সিস্টেমের মধ্যে এসে যায় তো, বুদ্ধিমতী আছে, অত আর ভাবতে হয় না, ক্লাসে ক্লাসে এগিয়ে যাবে আপনি। না, বল তুমি।”

সকালের কথা; দুপুরে বেটাছেলে তিনজন খেতে বসেছে, জ্যাঠাইমা বসে আছেন, অরুণা হাওয়া করছে, ষষ্ঠীচরণ হঠাৎ মুখ তুলে বলল—“মণীশ রাজী হয়েছে রে রুণাদি, তুই সকালে যা বলছিলি। থাকবে।”

রুণার মুখটা একটু নিষ্প্রভ হয়ে গেল, পাখাটাও সেকেণ্ড দু-চার থেমে গেল, বলল—“তাই নাকি?”

আবার সামলে নিয়ে বলল—“বাঃ, বেশ হোল।”

মণীশ একটা গ্রাস মুখে নেওয়ার জন্যে মাথাটা নীচু করেছিল, একটু সেইভাবেই রয়ে গেল, তারপর কিন্তু সোজা অরুণার মুখের ওপরই দৃষ্টি তুলে বলল—“আমি বলছিলুম না হয় থেকেই গেলুম কয়েক দিন, কিন্তু তাতে কতটুকু কাজ হবে?”

“কয়েক দিনই বা কেন? তোমার কী কাজ এখন? পরীক্ষার রেজাল্ট না বেরুনো পর্যন্ত তো স্বচ্ছন্দেই থেকে যেতে পার।”

“ওরে বাবা! ততদিন?”

“না ভালো লাগে, তখনকার ব্যবস্থা তখন হবে।”

মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে রাখল। কথাবার্তা সহজ করে আনবারই চেষ্টা করল মণীশ, বলল—“ভালো লাগবে না কেন? জায়গাটা

আমার তো ভালোই লাগে, জান। বল না, বছর-কে-বছর কাটিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু…"

"কাজটাও না ভালো লাগে, তখন ব'লো বরং।"

এবার আর ততটা স্থিরভাবে চেয়ে থাকতে পারল না। ও প্রসঙ্গটায় ঐখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ল।

ওদের খাওয়া শেষ হলে অরুণা তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে গিয়ে যেন বাঁচল। ভেতরটায় একটা জ্বালা ধরেছে অনুতাপে। ছি ছি, কি করে ইঙ্গিতটা করতে পারল মণীশের মুখের ওপর। এই তার সংযম? সে নিজে হতেই না সংকল্প করে ব্রত নিয়েছে? এই ভাবে উদ্‌যাপন করবে তার ব্রত? দুটো দিনও যা ধরে রাখতে পারল না, সারা জীবনটা রাখবে ধরে?

বিছানায় পড়ে রইল খানিকক্ষণ, একটানা জীবন বেশ চলছিল, এ আবার নূতন কী একটা আরম্ভ হয়ে আর যেন বাঁচতে দেবে না তাকে।…পারছে না আর।

পড়েই রইল অনেকক্ষণ, তারপর মনটা আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল, অনেকটা সেইদিনের মতো। একটা স্নিগ্ধতা…সবাইকে ক্ষমা, নিজেকেও। না, অরুণা ঠিক অমন নয় তো, অমন হতে দেবে না তো নিজেকে।

উঠে পড়ল। মালাকে ভয়। এখুনি খেতে ডাকতে এসে দেখে ফেলবে…বলবে—"কি হোল রুণাদি?…শরীর খারাপ?…না, তাহলে যাওয়া হবে না তোমার—কোন মতেই না…"

দিনদিনই যে বেশী করে জোর খাটাচ্ছে মেয়েটা ওর ওপর।… আবার একটা ঢল নেমেছে অরুণার মনে—স্নেহের, প্রীতির, করুণার। ঠিক করে নিয়েছে বিক্ষত মনটাকে, যা করবে তাও।

তিনটেয় গাড়ি। খাওয়া-দাওয়ার পর আর সময় পেল না, মণীশ নিজের ঘরে আরাম করছিল, তন্দ্রাই এসে গিয়েছিল, তুলল তাকে। বলল—"একটা কথা আছে; কিন্তু ভয় হচ্ছে তোমায় বলতে।"

"কথাটা কি ?"—একটু উদ্বিগ্ন হয়েই প্রশ্ন করল মণীশ।

"আজ এই ট্রেনে যাচ্ছি তো ? একাই যাব ঠিক করেছিলুম, সন্ধ্যের আগেই তো যাচ্ছি পৌঁছে। কিন্তু ভেবে দেখছি, একজন সঙ্গে গেলেই যেন ভালো হ'ত।"

"আমি যাই তাহলে। ঠিকও নয় একলা যাওয়া। দুর্বল রয়েছ এখনও।"

"তাই ভাবছিলুম। দাদু, বড়দা, জ্যাঠাইমা—সবাই বলছিলেন কেউ সঙ্গে গেলে হ'ত, গা করি নি। এখন বলতে গেলে বোধ হয় যেতেই দেবেন না, ভাববেন নিশ্চয়ই হয়েছে কিছু···"

"সত্যিই মনে হচ্ছে না তো সে-রকম কিছু ?"

অন্তর দিয়ে আগেকার মতোই মণীশের এই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়া—বেশ ভালোই লাগল অরুণার, কণ্ঠে একটু আবদার ঢেলেই বলল—"না গো না, তুমিও অমনি ভেবে সারা হলে।···যেতে হলে তোমাকেই যেতে হয়। তোমার যাওয়ার একটা সুবিধে এই যে বলতে পারবে—বাড়িতে বলে আস নি, একবার বলে এসে একেবারে নিশ্চিন্দি হয়ে থাকবে দিনকতক। কিন্তু তোমাকেই যে আবার বেশী ভয়।"

"ভয়টা কিসের ?"

"ভয়, একবার বেরুতে পারলে আবার ফিরে না আস, অনেক কল-কাঠি নেড়ে কোন রকমে আটকে রাখলুম তো।"

গাড়িতে যতটা পারল শুধু মালার কথাই চালিয়ে গেল। কত অসহায় বেচারী, কী সর্বনাশটা হতে যাচ্ছিল ওর—ওর প্রসঙ্গ নিয়ে সমাজের অবস্থা, বিশেষ করে মেয়েদের এই অসহায় অবস্থা, নানা কথাই এসে পড়ছে। আলোচনাটা ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে—একই ভাবে ভাবিত দুজন শিক্ষিত যুবক-যুবতীর মধ্যেই তো ; সমাজনীতি থেকে রাজনীতি—সমস্যা থেকে সমাধানের কথা।···কিন্তু যত ছড়িয়েই পড়ুক অরুণা আবার গুটিয়ে-সুটিয়ে একটি কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনতে লাগল—সেই এক মালার কথায়। মণীশের মনটা যতটা

পারছে সিঞ্চিত করে আনছে—ত্বপুরের ইঙ্গিতে যদি কিছুমাত্র গ্লানি লেগে থাকে ওর মনে তো নিরবশেষ করেই মুছে দেবে।

হয়তো সফলও হোল। গাড়ি থেকে, ঐ আলোচনা শেষ করে নামবার মুখে অরুণা একটু সন্দেহের অভিনয় করে অল্প হেসে বলল, "তাহলে ঠিক তো? দেখো!"

মণীশ আর হাসল না, ওর মুখটাও ভেতরকার সংকল্পে শান্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একটু আবেগ ভরেই ওর হাতটা ধরে বলল —"তোমায় কথা দিচ্ছি রুণাদি, মালার কথা আমি ভুলব না কখনও।"

১৩

মণীশ যে অরুণাকে বলল—"জায়গাটা আমার ভালোই লাগে"—তার এক বিন্দুও মিথ্যা নয়। সত্যই তার বড় ভালো লাগে মার্টিন লাইনের এই অবহেলিত ক্ষুদ্র পল্লীটিকে। কলকাতার বাইরে গঙ্গার তু ধারের পল্লীগুলিতে সে মাঝে মাঝে যাওয়া-আসার সুযোগে কিছু কিছু অভ্যস্ত ছিল। বাড়ি আছে, রাস্তাঘাট আছে, খানিকটা মার্জিত শ্রী আছে, ওরা যেন কলকাতার সাজানো-গোজানো মেয়ের দল—কেউ শিশু, কেউ বালিকা, কেউ কিশোরী, কেউ হয়তো আর একটু ওপরে। অরুণাদের এ গ্রামটি একটি উদাসীন বন-বালিকা, কিছু থাকার বালাই নেই বলেই যেন নিজের স্বপ্নেই আছে বিভোর হয়ে। কারা অবহেলা ক'রে দেখলে না—হুঁশ নেই। মণীশের মতো কে আবার বাইরে থেকে এসে প্রীতি-ঢালা মুগ্ধ দৃষ্টি নামিয়ে চেয়ে আছে—সে হুঁশও নেই।

ভালবাসার মন নিয়ে এলে উদাসীনকেই বেশী ভালো লাগে। তাই সেই প্রথম আসার পর থেকে ফিরে ফিরে এসেছে মণীশ।

কাজটা ভালো লাগবে কি না, একটা ছোট "কিন্তু" দিয়ে যে

সন্দেহ প্রকাশ করতে গিয়েছিল সেটা অবশ্য অভিনয়, মনের কথা নয়।

তাই হোলও, কাজের জন্যে আরও শতগুণ অপরূপ হয়ে উঠল জায়গাটুকু।

আশ্চর্য লাগে মণীশের। এত কথাও লুকানো ছিল এর বুকে। এত মধু ছড়ানো ছিল এর মাঠে-ঘাটে, বনে-প্রান্তরে, এর পানায়-ঢাকা ডোবায়, এর শাপলা-ফোটা পুকুরে।···কাজটা মণীশের হাতে হয়ে উঠল যেন রূপকথার সোনার কাঠি—তার স্পর্শে স্বপ্ন-লীনা বন-বালিকা জেগে উঠে যেন প্রাণময়ী হয়ে উঠেছে।

'কাজ' বলাটা কিন্তু ভুল, কাজ কোথায় ?

ষষ্ঠীচরণ যে বলেছিলেন, মালা ছড়ি হাতে করে পড়ানোর মতন মেয়ে—তার অনেকখানিই ঠিক। পড়বে কি, ও এদিককার নানা কাজ নিয়েই ব্যস্ত, একটানা বসে থাকা ওর কোষ্ঠীতে লেখা নেই। দেরি করে আসে, বইখাতা ফেলে যেন খেলাঘরের মধ্যে থেকে টেনে আনা ছোট মেয়ে। খানিকটা বোধ হয় শুনল বা নিজের মনেই পড়ল—তা যেটুকু তা মন দিয়েই—তার পর ওর হঠাৎ মনে পড়ে যায়···

"আসছি মণীশদা।"

"কোথায় ? এই তো দেরি করে এলেই এত।"

"দেরি হয়ে গেল বলেই তাড়াতাড়িতে ভুলে এসেছি। বড়-বৌদি তখন একটা পান দিতে বললেন যেন···"

কিংবা দাহুর ঘোলের কথা, তোয়ের করে রেখে এসেছে, দাহু হয়তো নিতে ভুলে যাবেন টেবিল থেকে। কিংবা আরও কিছু ·· আরও কিছু···

বাড়াবাড়ি হলে মণীশ এক-একবার মৃদু তিরস্কারই করে, বলে—"তোমার মনগড়া যত কাজ মালা, এ রকম করলে আমার মিছিমিছি এখানে বসে থেকে কি হবে ?"

মনগড়া কাজ নয় মালার, মিথ্যা কথার অভ্যাস নেই সেটা

মণীশও জানে। জানে যে মিথ্যা নয়, শুধু পড়তে বসে ওর মনটা ভেতরে গিয়ে যেন খুঁজে বেড়ায় কোথায় কি পড়ে আছে বাকি বা পড়ে থাকা সম্ভব। মনের দিক দিয়ে এর ভেতরের ট্রাজেডিটাও বোঝে মণীশ। একটা কম্‌প্লেক্স বা দুর্বলতা মনের—যেভাবে ওর জীবনটা কাটল, যে ভাবে কাটছে তাতে আসতে যেন বাধ্য। একটা সংকোচ লেগে থাকে ওর।

চেষ্টা করে এর চিকিৎসা করতে মণীশ।

বলল একদিন—"জান রুণাদি আমায় কি বলছিল?···বলছিল—ও ভাল হয়ে সেদিন ঘুম থেকে হঠাৎ উঠে দেখে, পায়ের কাছে চুপটি করে বসে আছ, উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি পায়ে হাত বাড়িয়ে দিলে।···দুঃখু করছিল।"

"ভয় করে···"

মনের কথাটা নিশ্চয় আচম্বিতেই বেরিয়ে গেছে। আর কিছু না বলে অপ্রতিভভাবে চুপ করে রইল। কিসের যে নিদারুণ ভয় সেটা তো উচ্চারণ করা যায় না, ওর জীবনের পাকে পাকে জড়ানো যে সে-ভয়—শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত। মণীশই আর মুখ তুলতে পারল না, বলল,—"নাও, পড়ো।"

একটু পরে মুখ তুলে ওর মনের সংকোচ দূর করবার জন্যেই বলল—"ওঁদের তো দেখছ কি-রকম লোক সব—দাদু, জেঠাইমা, বড়দা, বড়বৌদি—ওঁরা চান না তুমি এতটা গুটিয়ে-সুটিয়ে থাক। ওঁদের ইচ্ছেটা তুমি পড়াশোনা নিয়েই থাক এখন। দেখছ তো আপনা থেকেই ব্যবস্থাটুকু করেছেন—আমায়ও আটকে···"

বলবার আগেই সামলে নিতে যাচ্ছিল, মালা যেন কবে থেকে সুযোগ খুঁজছিল, বলল—"আপনারও কত কষ্ট। বাড়ি ছেড়ে পড়ে আছেন!"

এত সকরুণ দৃষ্টি যে কিছু আর যেন বেরুলই না মণীশের মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ। আর, বলতে হলে সব কথা তো বলাও যায় না এখন। আপাতত মনটা একটু গুছিয়ে নিয়ে ঐ কথাই চালাল—

বলল—ওঁরা কত ভালো, ওঁরা কত ভাবছেন ওর জন্যে—ভাবছেন সে কি প্রতিদানের আশা রেখে কোন? তা মনে করে যদি মালা ওঁদের সংসারে অতটা আত্মনিয়োগ করে, এদিকে অমনোযোগী হয়ে—তো ওঁদের প্রতি অন্যায়ই করা হবে না কি?…আর মণীশের কথা? তার আর কষ্ট কি, বরং স্বার্থই বেশী এতে। পরীক্ষায় শরীরটা একটু ভেঙে গেছে—দিনকতক এখানে নিরিবিলিতে থেকে সেটা ঠিক করে নেওয়া—ওকে নিয়ে দিনে বার দুই বসা, সেও একটু অন্যমনস্ক থাকবার জন্যই। স্বার্থই।

বলায় বিপদও আছে, এক-একদিন কি হয়, মালার চোখ দুটো হঠাৎ ছলছল করে ওঠে, নামিয়ে নেয় দৃষ্টি। মণীশকে বদলে দিতে হয় প্রসঙ্গ, বলতে হয়—"ওটা থাক্, এবার অঙ্কটা ধরো।"

একটু বেশী করে মন টানবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

—ওঁরা যে কত ভালো, কত নিঃস্বার্থ, কত চান ও পড়াশোনা নিয়েই থাকুক, তার প্রমাণ সংগ্রহও করে চিকিৎসার জন্য।

একদিন বড় বৌদিদি যে মণীশকে অমন ভাবে টুকল, সেটা এই উদ্দেশ্যেই, ওদের দুজনের মিলে একটি রচনা।

সকালে জলখাবারটা প্রায় নিজেই দেয়, সেদিন এসে খালি হাতেই টেবিলের সামনে দাঁড়াল; বলল—"এই যাঃ, কি একটা কথায় অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম…মালা, মণীশঠাকুরপোর জলখাবারটা নিয়ে আয় তো দিদি!"

মালা নিয়ে এলে বলল—"দেখ, কী মনে হোল আবার ভুলে গেলুম।…হ্যাঁ, এই যে তোকে দেখেই মনে পড়ে গেল। ঠিক কথা। হ্যাঁ ঠাকুরপো, বলছিলুম—তোমার ছাত্রীকে যদি মিনিটে মিনিটে ছুটিই দেবে তো পড়াবে কখন?"

মণীশ যেন আকাশ থেকে পড়ল, বলল—"আমি ছুটি দিই, বলে নাকি তাই? ওই বরং আমায় উল্টে বলে—অমুক কাজ আছে, তমুক কাজ আছে—বড়বৌদির কাছে অমুক কাজটা ছিল, তিনি আটকে রাখলেন…"

মালা খাবার সাজিয়ে রেখে জল আনতে যাচ্ছিল, মিথ্যে কথার বহরে ঘাড় ফিরিয়ে চোখছুটো বড় বড় করে বলল—"ওমা! আমি তাই বলি?…মণীশদা!"

বড়বৌ বিব্রত হয়ে উঠল, অবশ্য অভিনয়েরই অংশ, বলল—"ঠিক ওভাবে যদি নাও বলিস তো কথাটা তো সেই রকমই দাঁড়ায়—যদি অযথা দেরি করিস আসতে।…না ঠাকুরপো, যা দিব্যি করতে বল আমায়। ওই বরং বলে—ছুটি নিয়ে এসেছি, একটু বসি বৌদি। তা এই বুঝি তোর ছুটি নেওয়া!"

একটু হেসে জল আনতে চলে গেল মালা। একটু হাসির বিনিময় হোল এদের দুজনের মধ্যে। জল নিয়ে এলে বোঝাবার পালা আরম্ভ হোল—

"না মালা, ছেলেমানুষি নয়, ঠাকুরপো যদ্দিন আছেন একটু খেটেখুটে এগিয়ে যা বোন। করছিসই তো বুক দিয়ে, দেখতে পাচ্ছি না? কিন্তু ওঁরা যে-সময়টা পড়ার জন্যে আলাদা করে দিয়েছেন তার মধ্যে যদি টুপটুপ করে চলে আসিস·· যা, আসবি নি, রাগ করব। আসিস বেশী আমারই কাছে ছুতানাতা করে, তোর বড়দা জানতে পারলে কী রাগটা যে করবেন! জানিস তো মানুষটাকে…"

ফল হয় না কিছু। দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেই সংকোচের ভাবটা কাটছে, কিন্তু ইস্কুল-পালানোটা একটা দুরারোগ্য রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন একটু হেসে একটু আব্দারের সঙ্গে ছুটি চেয়ে নেয়। দেরি করে এলে যদি জবাবদিহি চাওয়া হোল তো নীরবে হেসে দেয় জবাব—অর্থাৎ মেনে নিচ্ছি অবাধ্য, ফাঁকিবাজ। একটু কড়া হতে গেলে অভিমানও করে আজকাল একটু।

কাজের বহর এই মণীশের। সুতরাং কাজ সোনার কাঠি হয়ে উঠেছে বললে ভুলই হয়। সোনার কাঠির খোঁজ নিতে হলে আর একটু এগিয়ে যেতে হয়।

এক-একদিন কী যে হয়, নিজেরও ভালো লাগে না। অবশ্য দোষটা চাপায় মালার ওপরই—

"না মালা, আজ তুমি বড় অন্যমনস্ক···আজ তুমি বড় অবাধ্য হয়ে পড়েছ মালা, এ রকম হলে আমিই বা করি কি?···নাঃ, যাও, আমিও একটু ঘুরে আসি তাহলে···বিরক্তি লাগিয়ে দাও তুমি এক-একদিন বড়···"

বেশীর ভাগই বিকেলের দিকে।

বেরিয়ে পড়ে সোনার কাঠি মুঠায় করে। যে পথ দিয়েই যায় শ্রী-সুষমায় সব যেন অপরূপ হয়ে উঠেছে—একটা সামান্য কুটীর, একটি লতা-জড়ানো সামান্য আগাছা—ঘাট থেকে কে জল নিয়ে উঠছে—চরতে চরতে গোরুটা মুখ ঘুরিয়ে দেখল, আকাশ বেয়ে এক গাছ থেকে আর এক গাছে একটা কি পাখী গিয়ে বসল, কিছুই থাকে না আর সামান্য হয়ে! একটি শান্ত সুর দেখতে দেখতে নিজেকে যেন পুষ্ট করে চলেছে।

বিকাল পড়ে আসে, কোন একটি জায়গায় এক সময় গিয়ে বসে—কতকগুলো জায়গা ওর ঠিক হয়ে আছে। একটি ছোট মাঠের এক প্রান্তে আড়াআড়ি হয়ে একটা কাটা তালগাছ আছে পড়ে—রাস্তা যেখানে গ্রাম ছাড়িয়ে ফাঁকায় পড়েছে, সেখানে একটি ছোট সাঁকো, বড় নদীর খালের ওপর বাঁশের পুল···

যেখানেই গিয়ে বসে, মালাও এসে বসে পাশটিতে। কখনও গাম্ভীর্যে, কখনও হাসিতে, কখনও একটু আব্দারে, কখনও একটু অভিমানে—পড়ার টেবিল থেকে কিংবা বাড়ির অন্য কোথাও থেকে স্মৃতির টুকরা যেমন যেমন রূপে নিয়ে এসে বসায় তাকে।

মালাময়ী হয়ে উঠেছে বলেই মণীশের চোখে অরুণাদের এই সুপ্ত পল্লীটি জেগে উঠে প্রাণময়ী হয়ে উঠেছে।

আটটা দিন যে কোথা দিয়ে চলে গেল যেন বুঝতেই পারল না মণীশ।

সোমবার সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে এসে রোজকার প্রথামতো মালাকে একটা হাঁক দিয়ে ওপরে উঠে যাবে, দেখল জ্যাঠাইমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছুটি দশ-বারো বছরের মেয়ের সঙ্গে কথা কইছেন। জ্যাঠাইমার কথার শেষের দিকটায় শুনল, বলছেন—"কি করে বলি বাছা, আমিও তো তাই ভাবছি…"

আবছায়া অন্ধকারে মুখ ছুটো যেন চেনা-চেনা ঠেকল, দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রশ্ন করল—"কি জ্যাঠাইমা? এদের যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।"

"দেখে থাকবে, তুমিও তো গিছলে পড়াতে শুনলুম, ওরা হচ্ছে অরুণার স্কুলের ছাত্রী, রাত্তিরে যাদের পড়ায়। জিজ্ঞেস করছে দিদিমণি ছুদিন এলেন না কেন? শনি-রবি পড়ায় তো ওদের।… তাই বলছিলুম, কি করে বলি? আমিও তো ভেবে পাচ্ছি না। ভালো করে সেরেও ওঠে নি, চলে গেল। তার পর, শনিবার-রবিবার বাদ দিস না, এলি নি, তা একটা চিঠিই দে, কিচ্ছু না। বুঝি না বাপু…"

কতকটা নিজের মনেই গরগর করে যাচ্ছেন, তারপর মণীশের দিকে মুখ তুলে বললেন—"বললুমও ষষ্ঠীচরণকে, বললে—কাকা আছেন। অত ভাবলে চলে?"

অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে গেছে মণীশ। ওকে লক্ষ্য করে বলতে একটু চকিত হয়ে উঠে যেন কিছু একটা জবাব দিয়ে খালাস হোল—"হ্যাঁ—তা—মানে, জ্যাঠামশাই যখন রয়েছেনই…"

"কিন্তু তাতে মন মানে বাবা? তুমিই বলো না।"

"তা কি করে মানবে!"—সেই ভাবেই তাড়াতাড়ি বের করে

দিল কথাটা। তার পর ঐ কথাটাই যেন ঘুরিয়ে নিয়ে এসে এদের দিকে চেয়ে বলল—"তা আজ তো তোমাদের দিদিমণি নয়। আজ সোমবার আমি পড়াব। এসে গেছ তো সবাই ?"

মোটে একটা সোমবার পড়িয়েছিল, তার পরেরটা অরুণার অসুখের হিড়িকে বাদ গেছে, তার পরেরটাও, বোধ হয় না থাকার জন্যই—মেয়ে দুটি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল, একজন বলল—"জানতুম নি তো ?"

একটু মাস্টারির টোনেই বলল মণীশ—"এই দেখ। সোম-মঙ্গল আমি পড়াব, তা যাদের পড়াব তাদেরই হুঁশ নেই। যাও সব ডেকে এনে ঘর খুলে ব'সো গে। আমি এলুম বলে।"

ওরা উৎসাহভরে হনহনিয়ে চলে গেল। দোরের কাছ থেকে গলা শোনা গেল—"চল্ গো চল্, আজ উনি এসবে।"

মণীশ বলল—"ঐ হয়েছে জ্যাঠাইমা—কটা দিন ক্ষতি হোল পড়ার, পুষিয়ে নিচ্ছে। ভাবনার কিছু নেই।"

উঠে গেল ওপরে, মন্থর চরণে। মালা যখন পড়তে এল, দেখে মাথাটা হাতের তেলোয় ধরে টেবিলে কনুই রেখে ঘাড় নীচু করে বসে রয়েছে। এত অন্যমনস্ক যে, সে যে উঠে এল হুঁশই হয় নি। বেশ একটু আতঙ্কিত হয়েই ডাকল মালা—"মণীশদা।"

"ও, তুমি ?···মানে, এসে গেছ ? বলছিলুম···"

"শরীর ভালো আছে তো আপনার ?"

"শরীরে কি হবে ? তোমায় ডেকেছি—আজ তো আমার রুণাদির ইস্কুলে কাজ।·· এটা জান মালা তুমি, তবুও মনে করে দাও নি, ভাগ্যিস মেয়ে দুটো এসেছিল।"

বিরক্তির ভাব যেন, সেইটাই আর একটু বাড়িয়ে ওর দোষটাও টেনে নিয়ে বলল—"অথচ নিজেও যে খুব পড়বার মেয়ে তাও না···"

এ ধরনের মৃদু তিরস্কার আজকাল প্রায় আছে, এই রকম সব সময় সঙ্গতিও খুঁজে পায় না মালা। তা ভিন্ন আজ তো আরও

গায়ে মাখবার কথা নয়। উৎফুল্ল হয়েই বলল—"আজ তাহলে আমার ছুটি তো?"

"তা হলেই তো বাঁচ।" গম্ভীরভাবে কথাটা বলে, বলল—"যাও, চা'টা দিয়ে যাও তাড়াতাড়ি।"

ভাবছে—কী করে ভুলতে পারল অরুণার এ শনিবারে না আসার কথাটা, তার পর রবিবারেও—অসুখ থেকে উঠেই চলে গেছে অরুণা—চিঠি আসে নি যে, সে-খোঁজটা রাখাও দরকার মনে হয় নি। আসল কথা, অরুণা এই সারা সপ্তাহটা ওর জীবন থেকে একেবারে বিলুপ্তই হয়ে গিয়েছিল—আশ্চর্য!—সম্ভব হোল কি করে?

কখন আবার সেই ভাবেই মাথাটা ঝুঁকে গেছে হাতের তেলোয়, মালা এসে সেইরকমই দেখল। প্রশ্ন করল—"সত্যিই বলছেন ঠিক আছে শরীর?"

বিরক্তিটা একটি হাসি দিয়ে চেপে বলল—"মিথ্যে বলব—শাসনের ভয় আছে তোমার কাছে?"

স্কুলে গিয়ে খুব মন দিয়ে পড়াল মণীশ, অরুণার দেওয়া কাজ। অন্তত চেষ্টা করল খুব—শুধু মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। শেষের দিকে অনেকটা সামলেও নিতে পারল চেষ্টা করে করে। এক ধরনের একটা আত্মপ্রসাদ ঠেলে উঠছে মনে—তবু যেন হোল কিছুটা, অরুণার প্রতি অবিচারটা একটু স্খালন হোল। শেষ হয়ে গেলে উৎসাহের ঝোঁকেই বলে দিল—এবার থেকে সে-ই এসে পড়াবে—রোজ।

"ছুটি থাকবে নি?" ওদিক থেকে প্রশ্ন হোল।

"চাই-ই ছুটি?"

—একটু হেসেই প্রশ্ন করল মণীশ।

একটা গোলমেলে শব্দ উঠল, তাতে 'না'ও আছে 'হ্যাঁ'ও আছে। স্কুল বরখাস্ত করে হাসিমুখেই বাড়ি ফিরল মণীশ। অনেকটা যেন শুধরে নেওয়া গেল।···মালার প্রতি ব্যবহারটা তখন একটু রূঢ় হয়ে গেল? সেটাও কি ঠিক করে নেওয়া যায় না?

এসে তিরস্কারই করল একটু। রান্নাঘরে বৌদির সঙ্গে গল্প করছিল। চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে বিস্ময়ের ভান করে বলল—"তুমি এখানে মালা, নিজেই না হয় বসে বসে পড়তে একটু।"

মালা বড়বৌয়ের কাছে নালিশ জানাল—"দেখুন বড়বৌদি; অথচ নিজেই ছুটি দিয়ে গেলেন।..."

"ছুটি—মানে আমি পড়ালুম না। নিজে পড়তে একটু বসে। ঐ একটি বিষয়ে মালা আপনাদের একেবারে অক্ষর ধরে ধরে বাধ্য বড়বৌদি—রুণাদির মেয়েদেরও হার মানাল—ছুটির কথা যদি একটু মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল..."

শেষের দিকে মনটা আরও প্রসন্ন হয়ে উঠল, আরও একটা ঠিক করে ফেলেছে।

সবাই খেতে বসেছে, জ্যাঠাইমা সামনে বসে আছেন, পাশে মালা; বড়বৌ পরিবেশন করছে, এ-কথায় সে-কথায় অরুণার কথা এসে পড়ল, জ্যাঠাইমাই তুললেন—"বেয়াক্কেলেপনার যেন হদ্দমুদ্দ নেই—একখানা চিঠিও দেয় মানুষে..."

ষষ্ঠীচরণ বলল—"তোমায় তো বললুম—কাকা যখন রয়েছেন..."

"কাকা তোমার আবার একটা মানুষ! কিছু হলেও খেয়াল থাকবে যে একটা চিঠি দিয়ে দেওয়া দরকার?" হেসে উঠলেন ললিতমোহন, বললেন—"হ্যাঁ মা, ভাজ হলে কি একটু কামড় দেওয়াই নিয়ম? দেখলে তো একটু কিছু হয়েছে, ঘাড়ে করেই নিয়ে এনে ফেলল অচল সেদিন।"

বোধ হয় ভাজের সম্বন্ধেই টিপ্পনী করে বসলেন সাবিত্রী দেবী—"তাও যেন বাড়াবাড়িই নয়?"

সবার হাসিতে একটু অপ্রতিভ হয়ে উঠে বললেন—"বলব না? হঠাৎ দুজনকে দেখে বুকটা যেন ছাঁৎ করে উঠেছিল।"

ভেতরে একটা গলদ রয়েছে বলেই কথাটা কি ভাবে বলকে

ভাবছিল মণীশ এতক্ষণ; বলল—"ভাববেন না জ্যাঠাইমা, আমি ভাবছি কাল একবার হয়ে আসব···"

"তুমি যাবে!"

ভেতরের লজ্জায় মণীশ মুখ তুলতে পারল না, হেঁট মুখেই ভাত মাখতে মাখতে বলল—"হ্যাঁ, হঠাৎ একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেল···বাড়িতে।"

"আমি মনে করলুম একবার বলি, তার পর ভাবলুম—শরীরটা ভালো নয়, টানাপোড়েন এর ওপর···"

সহজ হয়ে উঠতে পারল মণীশ। একটু হেসে বলল—"শরীর তো বাঘের মতন কেঁদো হয়ে উঠলেও আপনার চোখে পড়বার কথা নয় জ্যাঠাইমা—স্টেশনের ওজনের কলে দেখলুম পাঁচ সের বেড়েছি —এরই মধ্যে।"

"আচ্ছা, হয়েছে! অলুক্ষুণে ওজন এক।···তা বেশ বাবা, যখন কাজই আছে, হয়ে এস একবার। বাঁচালে; মনটা ঐখানেই পড়ে রয়েছে তো।"

"বাঁচল আসলে একজন জ্যাঠাইমা···"

মালা বোধ হয় বলার ঢঙেই মুখ তুলে চাইল। মণীশ বলল— "ঐ যে পাশেই বসে আছেন···"

ষষ্ঠীচরণ হেসে বললেন—"ও! ছুটি?"

মালা জ্বালাতন হয়ে উঠল যেন, বলল—"ব্যস, দুজনেই এক হলেন···পড়ি না যেন!···হ্যাঁ জ্যাঠাইমা?"

জ্যাঠাইমা স্নেহভরে পিঠে হাত দিয়ে বললেন—"না রে, রাত পর্যন্ত পড়ে, আমার কাছেই শোয় তো।"

"তাও যেন বাড়াবাড়ি নয়?"

এই একটু আগে সাবিত্রী দেবীরই মুখের কথা, সবাই বেশ ভালো করেই হেসে উঠল, এবার একসঙ্গে।

মনটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে মণীশের।

ওকে দেখেই অরুণা বলে উঠল—"মণীশ নাকি!"

মুখে একটা আলো ফুটে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে যেন চাপা দেওয়ার জন্যই একটু গম্ভীর হয়ে উঠে বলল—"তা তুমি হঠাৎ যে?"

কতকটা যেন জবাবদিহি চাওয়ার মতো; একটা কাজ যখন নিয়েছেই হাতে তুলে।

"তুমি শনিবারে গেলে না যে?...রবিবারেও নয়·· ভালো আছ তো?"

"এই জন্যে ভেবে সারা!"

একটু হাসল মণীশ, বলল—"আমার কথা বাদ দেওয়া যায় স্বচ্ছন্দে। তবে বাড়িতে ভাববার লোক আছে তো?"

খোঁচাটা গায়ে নিল কি নিল না বুঝতে দিল না অরুণা। কলেজ থেকে একটু আগে ফিরে গোছগাছ করছিল, বলল—"ব'সো, তোমার জন্যে একটু চা করি।"

"আমি চা খেয়ে এসেছি।"

"তোমার একার জন্যে নয়, আমিও খাব একটু।"

"খাও নি কলেজ থেকে এসে এখনও?"—প্রশ্নটা একটু উৎসুকই শোনাল।

"খেয়েছি। তবু খাব আর একবার।"

সুবিধা পেয়ে ওর 'বাদ দেওয়া'র কথাটার উত্তর দিল—একটু হেসেই, "আজ একটা নতুন আবিষ্কারে মনটা বড় খুশী হয়ে উঠেছে এতদিন জানতুম না।"

"যথা?"

"এতদিন আমার কথাও ভাবছিল একজন।"—হেসে চাইল একটু, তার পর বলল—"ব'সো, স্টোভটা এই ঘরেই নিয়ে আসছি, চা করতে করতে গল্প করব।"

স্টোভ ধরাতে ধরাতেই বলল—"আমার স্কুলের খবর কি ?… তোমার নিজের স্কুলের ?"

প্রশ্নটা করেই মুখ তুলে চাইতে দেখল মুখটা হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠেছে মণীশের, কিন্তু ও সামলে নিয়ে একটু বাঁকা করেই বলল—"আমায় জ্যাঠাইমা পাঠিয়েছেন, ভেবে সারা হচ্ছেন তিনি।"

হেসেই জবাব দিল অরুণা—"সেটা ধরে নিয়েই তাঁর কথা আগে তুলি নি। না ভেবে সারা হলে জ্যাঠাইমা হওয়া যায় না।"

"কথায় তো পারবার জো নেই তোমার কাছে।"—হার মেনে হেসে উঠল মণীশ, তার পর বলল—"আমি ছুটো স্কুলেই কিন্তু ইস্তফা দিয়ে এলুম…"

পাম্প করা থামিয়ে একেবারে সোজা হয়ে উঠল অরুণা, বলল—"সে কি।"

মুখটা রক্তহীন হয়ে গেছে।

অচলনাথ এসে পড়লেন। ভালবাসেন, উৎফুল্ল হয়ে অনেকগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে করে বসলেন—"মণীশ যে! কখন এলে? ভালো আছ তো? সেখান থেকেই তো আসছ, খবর কি ?"

"খবর ভালোই স্যার। রুণাদি শনিবারে গেল না, রবিবারেও না…"

"আমায় বললে—কদিনে ক্ষতি হয়ে গেল…"

"চিঠিও দিলে না একটা…"

অরুণার সেই চপল ভাবটা নেই, খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, তবু স্টোভের কাছে বসে তির্যক দৃষ্টি ফেলে বলল—"আরম্ভ হোল নালিশ ?"

তাড়াতাড়ি করে ওর এই বলবার ভঙ্গিতে অচলনাথ জামা ছাড়তে ছাড়তে একটু হেসে উঠলেন, বললেন—"নালিশ নয়, তোমায় তো কেউ বনবাস দিতে যাচ্ছে না এর জন্যে, তবে চিঠি একটা দিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। ওকে আর ছুটে আসতে হয় না সাত-তাড়াতাড়ি।"…

..."তবেই হয়েছে, আপনি বুঝি ভেবেছেন—রুণাদি আছে কি ম'ল সেই ভাবনাতেই ছুটে এসেছে ও? আসলে ওরই হয়েছে বনবাস ওখানে।"

মণীশের মুখের ওপর দিয়ে একটু বাঁকা দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এসে বলল—"দুটো দরকারী কাজের দায়িত্ব নিলে—তা ছেড়েছুড়ে দিয়ে..."

—বেশ একটু রাগের ভাব।

অনেকক্ষণ গল্পসল্প হোল তিন জনে মিলে, বেশীর ভাগ বাড়ি নিয়ে, সাধারণ ভাবে, আবার সমস্যা ধরেও। ষষ্ঠীচরণের ছোট ভাই করালীচরণ চাকরি নিয়ে বিদেশে। লিখেছে কষ্ট হচ্ছে মেসে থেকে, বাড়ির খোঁজে আছে। জ্যাঠাইমা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছেন। করালী লেখে নি অবশ্য, তবে আলাদা বাড়ি করতে হলেই ছোট বৌকে নিয়ে যেতে হয়, আজ না হয় দুদিন বাদে। গিয়ে থাকবে কে সঙ্গে? যেতে হলে তো এক তিনিই আছেন, এদিকে শ্বশুর। বৌমা রয়েছেন অবশ্য, তবুও মনটা তো এখানেই পড়ে থাকবে। কি করবেন সেকথাও জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন অচলনাথকে। একটা নতুন সমস্যা।...হ্যাঁ, মালা নিজে পড়ে যাচ্ছে, ভালোই তো মনে হয়। গাঁয়ের খবরের মধ্যে, মেয়েদের জন্যে একটা আলাদা মিড্‌ল্ স্কুল হওয়ার যে কথাটা উঠেছিল ঘোষেদের চণ্ডীমণ্ডপে, সেটা আরও জোর হয়ে উঠেছে। ললিতমোহনকে সভাপতি করে কায়দাদুরস্ত ভাবে একটা মীটিং হয়ে গেল—রেজল্যুশন পাশ হল, চাঁদার খাতাও তোয়ের হয়েছে, জমি দিলেন ললিতমোহনই, ঘোষপুকুরের ধারে ওঁদের দুই বিঘের লাখরাজটা।

জল বাড়িয়ে দিয়ে তিন জনেরই চা নামিয়ে নিয়েছে অরুণা, হালুয়াও হয়ে এল, এরই মধ্যে গল্পেও যোগ দিয়ে যাচ্ছে—প্রশ্নে-মন্তব্যে। স্কুলের কথায় হালুয়াটা নাড়তে নাড়তে দৃষ্টি না তুলেই বলল—"বাঁচা গেল; মালাটাকে পড়াবার জন্যে আর কারুর হাতে-পায়ে ধরতে হবে না।"

অচলনাথ অত বুঝলেন না। মণীশ একটু মুখ টিপে হাসল।

সন্ধ্যা হয়ে আসার আগে অরুণা প্রশ্ন করল—"বেড়াতে যাবে তো জ্যাঠামশাই তুমিও?"

হয়তো প্রতিদিনের মতো যেতেনই; অরুণা এমন ভাবে প্রশ্নটা করল, ওঁর যেন মনে পড়ে গেল—না গেলেও চলে আজ, বললেন—"তোমরাই যাও, মণীশ তো রয়েছে আজ। আমি একটু পরীক্ষার খাতাগুলো নিয়ে সকাল সকাল বসি; কাজ এগুচ্ছে না মোটেই।"

রাস্তায় বেরিয়েই অরুণা মুখের দিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করল—"সত্যি কাজ ছুটো ছেড়ে দিয়ে চলে এলে নাকি?"

মণীশ বলল—"চল বলছি।"

"বলই না। এমন কি সুবচনীর ব্রতকথা যে বসে ফুল হাতে করে শুনতে হবে! বল। স্কুলে না যাও কিছু বলবার নেই, আমার নিজের কাজ⋯"

"মালাকে পড়ানোটা আমার নিজের কাজ নয়?"

ছু-চার সেকেণ্ড এমনি গেল। অরুণা যেন একটু ভেবে নিয়ে বলল—"যতটা আমার ততটা তোমার অবশ্য যদি মনে কর—অসহায় মেয়ে একটা, ভেসে ভেসে এসে আটকে গেছে আমাদের এখানে⋯"

কাছেই পার্ক, এসে পড়েছে ছুজনে, অরুণা বলল—"চল না-হয় বসিই একটু ঐ বেঞ্চটায়।⋯সত্যিই ছেড়ে দিয়ে এলে?"

বসল ছুজনে, একটু মুখোমুখি হয়ে। মণীশ বলল—"তোমার স্কুলে কাল গিয়েছিলুম। শনিবার রবিবার যাওয়া হয় নি—যদিও উচিত ছিল যাওয়া, তুমি যাও নি। কিন্তু খেয়াল হয় নি একেবারে, তার জন্যে মাফ চাইছি।"

"খেয়াল হয় নি!⋯ কেন?"—আশা আর আশঙ্কা ছুটো যেন একসঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছে কণ্ঠের সুরে। নিজেই যেন একটু থতমত খেয়ে গেল অরুণা, সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা একেবারে পালটে নিয়ে একটু অসহিষ্ণু ভাবেই বলল—"যেতে দাওই স্কুলের কথা,

বলল্লুম তো। ওটা অনেকটা শখের, মালারটা জীবন-মরণের কথা—এটা স্বীকার কর তো?"

'খেয়াল হয় নি!...কেন?'—এ প্রশ্ন ছুটো মণীশের পক্ষেও অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল, কেন যে খেয়াল হয় নি সে তো মনের একেবারে অন্তস্তলের কথা। আপনা হতেই সরে যেতে নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলল—"আমি স্বীকার করলেই হবে! যার কথা, যার সমস্যা তার চাড় থাকা চাই তো। সে তো দেখেছই।"

"পড়তে পড়তেই হবে—একটু এগুলেই।"

জ্যাঠাইমার মুখে মালার রাত করে পড়ার কথাটা মনে পড়ে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছে মণীশ, অরুণা তাগাদা দিতে একটু হেসে বলল—"সাধনাটা যেন আমারই—নয়?"

অরুণা ডান হাতে প্রায় ওর হাতটা ধরে ফেলছিল, এগিয়ে বেঞ্চের ওপর রেখে বলল—"না মণীশ—ছেলেমানুষ, বোঝে না নিজের ভবিষ্যৎ—সত্যি আমাদেরই সাধনা...তোমার কাছে অ্যাপীল করছি আমি..."

"আমায়ও একটু সময় দেবে না ভাবতে?"—ও-ও অ্যাপীল করার দৃষ্টি নিয়েই চেয়ে রইল মুখের পানে। তারপর বলল—"স্কুলটা তো হচ্ছেই, ও নিজের ব্যবস্থা নিজেই তো করে নিতে পারবে।"

হাতটা সরিয়ে নিল অরুণা, মুখ ভার করে বলল—"থাক্।...কত নিষ্ঠুর হতে পার তোমরা! একটা কথা কি করে বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে আমার, তাই নিয়ে..."

মণীশ হেসে বলল—"সত্যিই থাক্ একথা এখন। আজ সন্ধ্যেটা ঠিক ঝগড়া করবার মতন নয়, চল একটু বেড়িয়ে নিগে। তোমার পড়াশোনো কেমন হচ্ছে বল।"

সমস্ত দিনের গুমোটের পর চমৎকার একটি হাওয়া উঠেছে,জ্যোৎস্না-পক্ষ, ওরা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়াল—কখনও দাঁড়িয়ে পড়ছে, কখনও বসছেও। বাড়ির কথা—যেন পরস্পরের মন বুঝেই বাদ দিয়েছে; অরুণার পড়ার কথা, কলেজের কথা, কলকাতা-জীবনের সাধারণ কথা নিয়েই চলছে আলোচনা।

ঘুরে ঘুরে ওর পড়ার কথাতেই এসে পড়ছে, এটা যেন বেশী করে মণীশের চেষ্টাতেই আর অরুণার মৌন আনুগত্যে। শেষের দিকে পড়ার কথাই একচেটে হয়ে পড়ল—সাহিত্য—একেবারে শেষের দিকে কাব্য···অরুণার অনার্স কোর্সের ইংরেজী পাঠ্য—শেলী, কীটস্, হুইটম্যান, এজরা পাউণ্ড—পুরাতন, আধুনিক···

এক সময় মণীশ বলল—"চল, না হয় আজ তোমারই মাস্টারি করি গে একটু রুণাদি। দেখি কি করছ না করছ।"

অরুণা হেসে বলল—"হঠাৎ এ ঝোঁক! অবশ্য, চল, সেজন্যে বলছি না।"

"বললুম তো, আজ সন্ধ্যাটা নির্ঝঞ্ঝাটের সন্ধ্যা। অবাধ্য ছাত্রীর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বাধ্য ছাত্রী নিয়ে বসবার মতন, স্বীকার কর তো?"

"খুব করি। তবে একটা কথা বলে রাখি—বা মনেই করিয়ে দিই—বাধ্য ছাত্রী কিন্তু সব বিষয়ে বাধ্য নয়। ভোলে না সহজে নিজের কথাটুকু।"

মুখের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। একটু ভাবল মণীশ; তার পর বলল—"জানি, জিদে। তবু সুবোধ বলে বিশ্বাস আছে বলেই তো আমিও হাল ছাড়ছি না একেবারে। এও তো মাস্টারের একটা সাধনাই।"

আবার একটা ঝড় উঠেছে অরুণার মনে। তার অত যত্ন করে পুষ্ট করা সংকল্পের ওপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে, যেন ভেঙে চুরমার করে দেবে।

এই এতদিনের মধ্যে আজকের মতো এত কাছাকাছি ওরা আর কখনও আসে নি। মনের কোন্ অতলে পড়ে ছিল এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত অনুভূতি, কিসের আলোড়নে আজ ওপরে উঠে এল, দুজনেই যেন আজ নিজেকে আবিষ্কার করল।

বেশ কতক্ষণ দুজনে অরুণার পাঠ্য কাব্যের সংকলন-গ্রন্থটা নিয়ে কাটাল। ওদের আজকের মনের যা কথা তাই যে আছে এমন নয়, তবে যা আছে সবই বড় মিষ্ট আজ।

অরুণা বলল—"আজ মণীশ না-হয় এখানেই খেয়ে নিক্, কি বলেন, জ্যাঠামশাই ?"

অচলনাথ পরীক্ষার খাতা থেকে মুখ তুলে হেসে বললেন—"ভালোই তো। কিন্তু নেমন্তন্নটা নির্যাতন হবে না ? খাবে কি ?"

"পট্ লাক্ (Pot luck)—যা জোটে। আসলে ইচ্ছে হচ্ছে একসঙ্গে বসে খাই তিন জনে—অনেক দিন বাড়ি যাই নি, তবু মনে হবে যেন বাড়িতে খাচ্ছি—মণীশ এখন তো আমাদের চেয়ে বেশী করেই বাড়ির লোক।"

—অনেকখানি রচনা করে বলতে হোল, তা জুটেও গেল মন্দ নয় ; হালকা কতকগুলা কথা।

খাওয়ার পরও খানিকক্ষণ বসিয়ে রাখল, মণীশের বসে থাকবার সুযোগ করে দিল বলাও চলে ; আজ যা করছে ও, দুজনের মন বুঝেই করছে তো। এবার অবশ্য অচলনাথও রইলেন—বারান্দার জ্যোৎস্নায় বসে গল্প হোল অনেকক্ষণ তিন জনে।

রাত্রির অনেকখানিই বিনিদ্র কাটল অরুণার।…এত সম্ভাবনার কথা তো জানা ছিল না। এ কোন্ জগৎ ?—এভাবে কোথায় লুকিয়ে ছিল ? বুকে যেন ঝড় বয়ে চলেছে—স্তব্ধ রাত্রির প্রহর গুনে গুনে চলেছে অরুণা। এক-এক বার সংকল্পে আঘাত হানছে,

যে সংকল্পের জন্যই—পাছে নিজেই বিঘ্ন হয়ে দেখা দেয় বলে বাড়ি যাওয়া বাদ দিল অরুণা। রূঢ় আঘাত, আর যেন সামলানো যায় না।...শুনে যাচ্ছে প্রহর। এক সময় কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানতে পারে নি।

ঘুমিয়ে যে পড়েছিল, শিথিল-সংকল্প হয়েই কি ?

বিদায় নেওয়ার সময় মণীশ প্রশ্ন করে বসল—"হঠাৎ নেমন্তন্ন করে বসলে যে ?"

—হয়তো আজ অনেক কথা শোনবার ইচ্ছা হয়েছে বলেই করল প্রশ্নটা। অরুণা হেসে বলল—"এক ধরনের ঘুষ, খোসামোদও বলতে পার—কাজ দিয়ে এলুম, তা বড় অবাধ্য হয়ে পড়ছ যে।"

পরদিনই যে চলে যাবে এমন আন্দাজ দেয় নি মণীশ। তবে সমস্ত দিনটায় এল না। তার পরদিনও নয়।

একটা অস্পষ্ট মিশ্র অনুভূতি ঠেলে ঠেলে ওঠে বুকে। তার মধ্যে অভিমানটাকে একটু একটু চেনা যায়। অরুণা জোর করে মনটাকে প্রবোধ দিয়ে কাটাল দুটো দিন,—যেন চলে গিয়ে থাকে, যেন চলে গিয়েই থাকে...মালার নয়তো ক্ষতি হবে যে বড় !

তৃতীয় দিন কলেজে যাওয়া পর্যন্ত মনটা অনেকটা নির্বিকার হয়ে উঠেছে—নিশ্চয় চলে গিয়েই থাকবে মণীশ।

বইখাতা নিয়ে বেরিয়ে দরজায় চাবি দিচ্ছে, সিঁড়িতে যেন কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ একসঙ্গে ; পরিচিত কণ্ঠস্বরও। ঘুরে দেখে অরুণা আহ্লাদে বিস্ময়ে একটু নির্বাক হয়ে রইল, বিশ্বাস করতে পারছে না যেন, তার পর বলে উঠল—"ওমা, বড়দা !...আর ও কে ?...ওমা !"

তাড়াতাড়ি তালা বের করে নিয়ে পাল্লা দুটো ঠেলে একগাল হাসি নিয়ে এগিয়ে গেল। শুধু ষষ্ঠীচরণ নয়, তাঁর ছেলে নরু, অরুণার ছোট বোন সিপ্রা ; আর সব চেয়ে যা আশ্চর্য, মালা।

মালাকে একেবারে জড়িয়ে ধরল, বলল—"তুইও এসেছিস! ভাবা যায় না যে!"

সেই ভাবেই সবার সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। কি করবে, কি বলবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না। ঘরে এসে তবে সহজ, প্রাথমিক প্রশ্নটা মনে পড়ল, বলল—"তা বড়দা হঠাৎ—আর একেবারে দলবল নিয়ে?"

গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব। নরু ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে আছে, নজর পড়ল, "এই যে বাবাও আমার এসেছেন!"—বলে বুকে তুলে নিল তাকে। সিপ্রার মাথায় হাত দিয়ে বলল—"সিপ্রারও দিদিকে মনে পড়ল?...তা দাদা, হঠাৎ! বাড়ির খবর ভালো তো?"

জামা খুলে আলনায় রাখতে রাখতে ষষ্ঠীচরণ বললেন—"আগে তোদের খবর বল্ তো—যার জন্যে ছুটে আসা। কাণ্ডকারখানা কি? নিজে গেলি না, চিঠি নেই। মণীশ এল খোঁজ নিতে; সেও না-পাত্তা..."

"যায় নি মণীশ! তাকে অত করে ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্দি আছি! না বাপু!...খবর আর কি হবে? ভালোই। যাই নি, ওদিকে কটা দিন ক্ষতি হয়ে গেল তো। চিঠি দোব-দোব মনে করছি, মণীশ এসে হাজির। তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলুম, ওমা!..."

সব দোষটা মণীশের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বলল—"বল না এবার।"

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল আবার, নরুর জামা-জুতা খুলে দিতে দিতে বলল—"তা যায় নি, ভালোই করেছে মণীশ। আমি তো তাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করছি।...তা বইকি, নইলে তোমরা আসতে?...মালা আসত?"

মালার আসাটা আরও অপ্রত্যাশিত বলে বের হয়ে গেছে কথাটা মুখ দিয়ে। ওর দিকে দৃষ্টি পড়তে ওর মুখের রক্তাভা দেখে মনে পড়ল, দাদার সামনে কথাটা ভুল হয়ে গেছে; ঘুরিয়ে নিয়ে

প্রশ্ন করল—"তা দাদা, হঠাৎ মালাকে সুদ্দু নিয়ে এলে যে? অবশ্য, এনেছ খুবই ভালো করেছ, তার জন্যে বলছি না, তবে…"

মালাকে নিয়ে এসেছেন অনেকখানি চিন্তা করেই ষষ্ঠীচরণ। মালার যা জীবন তাতে তাকে দেখতে হবে, দুনিয়াটাকে বুঝতে হবে, শিখতে হবে। একেবারে বিয়ে না করবার কথাটা বাদ দিলে ওঁর দৃষ্টিতে অরুণার জীবনটা যেন আদর্শ হয়ে উঠেছে; অযথা পুরুষ-ভীতি নেই, অত্যধিক নারী-মন্যতা নেই। মালাকেও ঐ আদর্শে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তাঁর, শুরুও করেছেন; ওর তো আরও বেশী দরকার।

মালা কাছে রয়েছে বলেই অতটা আর ভাঙলেন না, বললেন—"বড় কুনো হয়ে যাচ্ছে না। ওর আবার ঘুরে বেড়ানো অব্যেস ছিল। মাঝে মাঝে ভাবছি নিয়ে আসব তোর এখানে।"

"খুব ভালো হবে দাদা।"

মালার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"আসবি তো?"

মালা নূতন পরিবেশে একটু বিমূঢ় হয়ে গেছে, একটু হেসে মাথা কাৎ করে সম্মতি জানাল।

"আসবি, খুব ভালো হবে। আমারও বড্ড একঘেয়ে লাগে এক এক সময়।… দাঁড়াও বড়দা, ঠাকুরকে বলে দিয়ে আসি…"

ষষ্ঠীচরণ বললেন—"আমরা সব খেয়ে এসেছি একরকম…"

"ওমা, কী যে বল বড়দা! আটটার ট্রেনে বেরিয়েছ তো! খেয়ে এসেছ বললেই শুনব? এসেছই বা কোন্ আক্কেলে বড়দা? এলেও সাজা হিসাবে দু বার করে…"

"আমি ঠায় নি।"

—নরু ষষ্ঠীচরণের মেজ সন্তান, বছর চারের কম বয়স, উচ্চারণ দুরস্ত হয় নি, কথাটা বলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

"মিথ্যে বলতে শিখেছিস এর মধ্যে?"—বাপ একটু ধমক দিল।

ঠোঁটটা একটু কেঁপে উঠল নরুর। অরুণা তাড়াতাড়ি বুকে তুলে নিয়ে চুমায় চুমায় বোঝাই করে সামলে নিল, ষষ্ঠীচরণকেই

উল্টে একটু ধমক দিয়ে বলল—"তুমি থাম বড়দা। বাপ মিছে বলছে কি ছেলে, আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ও বরং শিশু, শেখেই নি বলতে।···চল তো বাবা, ঠাকুরকে বলে আসি ভাত চড়িয়ে দিতে।···বড়দার বন্ধ, বাবুকে আমার না খাইয়ে নিয়ে এসে আবার বকেন!"

বুকে চেপে বকতে বকতে নেমে গেল।

ফিরে এসে বলল—"এই ছ্যাখো! মালা, তুই এখনও কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়েই আছিস!···"

এগিয়ে গিয়ে স্নেহ-মিনতির সঙ্গে বলল—"না ভাই, দেখেশুনে নে, দিদির এই ঘর-কন্না। পাশেই বাথরুম, মুখ হাত ধুয়ে নে, আমি চায়ের ব্যবস্থা করি। তুই বরং কর এসে, ঐ টিন থেকে আগে বিস্কুট দে তো এদের হাতে, আমি যেন সব গুলিয়ে ফেলছি আজ।"

ষষ্ঠীচরণ মনে করিয়ে দিলেন—"কলেজ যাচ্ছিলি তো।"

"হ্যাঁ, গেলুম আজ! মাস্টারী বুদ্ধি কিনা, তাই বলতে পারলে। জ্যাঠামশাইকেও খবর পাঠিয়েছি। আজ ছুটি ক্লাস তাঁর, ব্যবস্থা করে চলে আসবেন'খন এখুনি। তুমিও মুখ হাত ধুয়ে এসে ব'সো বড়দা, বাড়ির কথা শুনি।"

১৭

অচলনাথ এসেছেন ক্লাসের ব্যবস্থা করে। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই বসে গল্প করছিলেন। একটা চাবি-দেওয়া রেলগাড়ি এসেছে, নরু আর সিপ্রা বারান্দায় খেলছে।

অরুণার সেই 'কি করি, কি বলি' ভাবটা চলছে এখনও। অন্য-মনস্কতার মধ্যে একটু অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলল—"আমি বলছিলুম মালাদের না-হয় কলকাতার কিছু কিছু দেখিয়ে নিয়ে আসি গে।··· দেখিস নি তো কখনও?"

মালা মাথা নেড়ে জানাল—না, দেখে নি।

"চল্ তাহলে। চল বড়দা।"

ষষ্ঠীচরণ বললেন—"আমি যে একটু কাজও নিয়ে এসেছি ইস্কুলের, দু-এক জনের সঙ্গে দেখাও করে নেব ভাবছি।"

মুখ ভার করল অরুণা। বলল—"জানি গো জানি, তুমি যে বোনের টানেই আস নি তা আর কষ্ট করে বলে দিতে হবে না। বেশ, আমিই নিয়ে যাচ্ছি একটা ট্যাক্সি করে।···বেশী কোথাও হবে না, আজই যাবে বলছ, চিড়িয়াখানাটা দেখিয়ে নিয়ে আসি চল্, ঐ পথে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটাও হয়ে যাবে। আমি দারোয়ানকে বলে আসি, একটু গোছগাছ করে নে, ওদের জামা-জুতো পরিয়ে দে।"

সিঁড়ি দিয়ে নামছে, মণীশের সঙ্গে দেখা। খুব অপ্রত্যাশিত নয়, —এখানেই যখন ছিল, অরুণা বিস্মিত হোল না। ব্যস্ত আছে, একটু দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—"যাও নি তো? ঐ দেখ গে সব হাজির।"

"কারা?"

একটা কথা বলতে গিয়ে মুখে আটকে গেল অরুণার। বলল—"দেখই গে না। আমি আসছি এক্ষুনি।"

নেমে গেল।

ব্যাপারটা অন্য কিছু নয়। মণীশের বুকেও তো ওর মতোই একটা ঝড় বয়ে গেছে, বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, আজ একটা ঠিক করে নিয়ে, যেন ত্রুটি সংশোধন করেই অসময়ে এসে পড়েছে। উৎসুক-ভাবে ওপরে উঠে গেল।

গল্প করছে, অরুণা উঠে এসে একটু তাড়া দিয়েই বলল—"নাও, ওঠ দিকিন, এসে পেট ভরে গল্প-সল্প ক'রো।"

মণীশ ঘুরে চাইল, বিস্মিত প্রশ্ন করল—"কি হোল?"

"একটু বেড়িয়ে আসব সবাই।"

ষষ্ঠীচরণের দিকে চেয়ে বলল—"ট্যাক্সিটা সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল বেশ।"

মণীশ বলল—"কিন্তু আমার যে একটা দরকারী কাজ আছে।"

মুখটা একেবারে গম্ভীর করে নিল অরুণা, তার পর মাথায় একটা ছোট্ট ঝাঁকানি দিয়ে বলল—"চল্ মালা, চল্ সিপ্রা।···নরু, তোকে যেতে হবে না।"

একটু থমকেই গেছে সবাই, ষষ্ঠীচরণ প্রশ্ন করল—"কেন, নরুর কি হোল ?"

"না, শুধু আমরা তিন জন ; কোনও পুরুষের ওপর নির্ভর করি না ··"

—একটা হাসিই উঠেছিল, নরু সেটাকে আরও বাড়িয়ে দিল, অপরাধীর মতো ওর মুখের দিকে চেয়ে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল—"আমি পুলুছ নয়।"

অরুণাও গাম্ভীর্যটা ধরে রাখতে পারল না, মণীশকে বলল—"নাও, ওঠ দিকিন, আর দর বাড়াতে হবে না। যে-লোক তুটো দিন কামাই করে কাজ সারতে পারল না, সে একটা বেলায় পেরেও উঠবে না।"

হুকুমের ভাবটা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য অচলনাথকে একটু যেন বিব্রত হয়ে মিনতি করল—"ও মেজো-জ্যাঠামশাই, আপনি বলুন না একবার।"

আরও একটা ব্যাপারে অচলনাথকে এমনি করে মাঝখানে এনে ফেলল অরুণা।—

বেশ সূক্ষ্মভাবেই স্টেজ্‌টা পরিচালনা করে যাচ্ছে।

ফেরবার সময় মিউজিয়ামটাও দেখিয়ে দিল ওদের। বাসায় এসে দেখে—যেমনটি ভেবেই ছিল—ষষ্ঠীচরণ সেজেগুজে উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করছেন, ওরা প্রবেশ করলে হাত-ঘড়িটার দিকে দেখে নিয়ে বললেন—"কত দেরি করলি বল্ দিকিন—সঙ্গে সঙ্গেই বেরুতে হবে, নইলে লাস্ট্ ট্রেনটা পাব না।"

"সঙ্গে সঙ্গে বেরুতে হবে মানে ?"—বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল

অরুণা, বলল—"এতটা ঘুরে এল, একটু কিছু পেটে না দিয়েই যাবে ওরা ?···না বাপু, তা হয় না।···তুমি খেয়েছ কিছু ?"

"হয়ে গেছে।···নে, কথা বাড়াস নি।"—হাত-ঘড়িটা দেখে নিল।

"কথা বাড়ানো নয় দাদা। ও হয় না কোনমতে।···বেশ, এক কাজ কর না, থেকে যাও না রাত্তিরটা।"

অচলনাথ খাতার বাণ্ডিল নামিয়ে গোছ-গাছ করছিলেন, এরা চলে গেলেই আরম্ভ করবেন দেখা, বললেন—"সেও মন্দ নয়।"

"মন্দ নয় কি কাকা! আমার মর্নিং স্কুল। জানে না রুণাদি ?"

"তাও তো বটে।"—অরুণার দিকে চাইলেন অচলনাথ।

অরুণা বলল—"তবে দাদা চলে যান, আমিই কাল গিয়ে দিয়ে আসব কোন সময়। আর-একদিন না হয় কলেজ কামাই হবে, কি করব।···এভাবে কচি ছেলেকে পাঠিয়ে দিতে পারব না আমি—পৌঁছুতে যার নাম রাত দশটা, খাওয়া নেই দাওয়া নেই, সিপিটারও মুখ শুকিয়ে গেছে।···"

"তাই করিস তা হলে।···আমি আসি কাকা।"

হাত-ঘড়িটা দেখে নিয়ে প্রণাম করে হন হন করে বেরিয়ে গেলেন। অচলনাথ বাণ্ডিলের গেরো খুলে অরুণাকে বললেন—"কেন, মণীশ যাবে না ?"

ও পাটটা সেরে মুখটা হালকা হয়ে এসেছিল অরুণার, আবার ভারী করে নিয়ে বলল—"বলে দেখুন আপনি। আমি আর বলব না, কথা থাকে না।"

মণীশ যেন আশঙ্কাই করছিল, বলল—"রেখে আসব'খন না হয়।"

মালার মতটা এতক্ষণে চাইল অরুণা, প্রশ্ন করল—"কি লো, ভালো লাগছে না ?"

খুব ভালো লাগছে মালার, তবে একটু চাপা রয়েছে সব কিছুর মধ্যেই। নূতন পরিবেশ, একটার পর একটা বিস্ময়ে যেন সহজ হয়ে উঠতে অবসর পাচ্ছে না।

অল্প হেসে ঘাড় কাৎ করল।

জবাব দিল নরু, বলল—"ভাল লাগচে পিছি।...খাবাল কই?"

অরুণা তাকে বুকে তুলে নিল,চেপে ধরে বলল—"আমার হাঁদারাম গোবিন্দ, পেট ভরলেই আনন্দ।...এই ছেলেকে শুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, বাপ, না পাষাণ!"

বেশ প্ল্যান মতো কাজ হয়ে যাচ্ছে, নিজের স্টেজ পরিচালনায় সন্তুষ্টই অরুণা। এর পর বলল—"তাহলে যখন ঢালা সময় পাওয়া গেল, চল্ মালা, পার্ক থেকে একটু বেড়িয়ে আসি, চমৎকার জায়গা, যাবি? পার্ক হোল এখানকার বাগান আর কি!"

"চল না।" খুশী হয়েই বলল মালা।

মণীশকে একটু বাঁকা করেই প্রশ্ন করল অরুণা, যেন রাজী হবে না ধরে নিয়েই—"যাবে সঙ্গে? না, মর্নিং স্কুল তোমারও?"

মণীশ হাসল, বলল—"থাকলেও রেহাই পাব?"

একবার দায়ে খালাস হওয়ার জন্য অচলনাথকেও জিজ্ঞাসা করল অরুণা। তিনি খাতাগুলোর দিকে দেখিয়ে বললেন—"আমার মর্নিং স্কুলের চেয়েও ঠ্যাকা, দেখছই তো।"

নরুর একটা কাঠের ঘোড়া কেনা হয়েছে, প্রস্তাব করল সে তাইতে চড়েই যাবে। অরুণা বলল—"এখন বইতে পারবে না তো। বাগানে ঘাস-টাস খেয়ে তোয়ের হলে চড়বে তখন। সিপা-পিসি কোলে করে নিয়ে চলুক এখন ওটাকে।"

পার্কে এসে মালার মনের জড়তাটা আস্তে আস্তে কেটে আসতে লাগল। সমস্ত দিন নূতন নূতন দেখায় অভিভূত হয়েছিল, এখানটা নূতন হলেও ঠিক সে ধরনের কৌতূহল-জাগানো অভিনব কিছু নয়। একটা বেশ বড় মাঠ, জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে—মাঝে মাঝে ছুটো তিনটে করে ছোট-বড় গাছ, একসঙ্গে, কোথাও বা একটাই—সবুজ বেঞ্চ পাতা—এখানে ওখানে ছোট ছোট বেড়া দিয়ে ফুলের কেয়ারি, —ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল সবাই। অরুণা লক্ষ্য রেখে যাচ্ছে—আস্তে আস্তে মালার মনের দলগুলি একটি একটি করে যেন খুলে

যাচ্ছে।...আজ মালাকে ওর বড় করুণ মনে হচ্ছে। চলতে ফিরতে কথা বলতে ওর মুখের আলোছায়া ওকে বড় রহস্যময় করে তুলছে অরুণার চোখে—কারুণ্যে রহস্যময়। মালা যেন একটি ঘুমন্ত পরীই, হাসে না, কথা কয় না, নিজের জীবনের অভিশাপে স্তিমিত, সুপ্তিমগ্ন।...কোন্ দেশের রাজপুত্রকে ডেকে আনতে হবে সোনার কাঠির স্পর্শ দিয়ে ওর সুপ্তি ভাঙতে ?

ঘোরা-ফেরার মধ্যে এক-এক বার আত্মলীন হয়ে পড়ছে অরুণা। ওর সেই সংকল্প—কী কঠিন! এই মধু-ছড়ানো জ্যোৎস্নায় আরও কত কঠিনই না হয়ে উঠছে। তা হোক, তবু রাজপুত্রকে ডেকে আনবার, তাকে অবহিত করবার, লুব্ধ করবার অভিযান তারই, তাকে যেতেই হবে এগিয়ে দুস্তর সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে, সঙ্কটময় কণ্টকাকীর্ণ দীর্ঘ পথে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে।...

একটি মাঝারি গোছের পুষ্করিণী একধারে। ওরা রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়াল মালার কথাতেই। ধীরে ধীরে সবাক হয়ে উঠেছে মালা, বলল—"কী চমৎকার এখানটা! কী চমৎকার ফুল ফুটে রয়েছে!"

বললও মণীশকেই—"আমাদের ওখানে ঘোষপুকুরের মতন না কতকটা মণীশদা ?"

মণীশ মুগ্ধ প্রশংসায় একটু মগ্ন কণ্ঠে বলল—"হ্যাঁ, রাঙা শাপলা।"

রাজপুত্র কি হয়ে উঠল সচেতন? দিল কি স্পর্শ সোনার কাঠির ?...বুকের মধ্যে একটা কিসের বেদনা না কি ওটা ?...তা হোক, অরুণা পারবে।

মৃদু দক্ষিণা হাওয়ায় জলে কুঞ্চন-রেখা তুলেছে, শাপলার ফুল আর কলিগুলোকে দোল দিচ্ছে।...মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল বলে অরুণার কথা কমই হয়ে এসেছিল, আরও কম। সময়টা তো পূর্ণ করতে হবে,—ওদের কথা গেছে বেড়ে।...ক্রমে নিজের অতীত থেকেও দু-একটা অভিজ্ঞতা টেনে নিয়ে এল মালা—

—যা কখনও করে না—কবে বৈরাগীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে কোথায় এই রকম ফুলের মেলা দেখেছে, কোথায় এইরকম ভরা জ্যোৎস্নার রাত্রি···

পেছনে ঘোড়া নামিয়ে খেলা হচ্ছে নরুর, সিপা রয়েছে অনেকটা সহিসের কাজে।

একসময় কথার পূর্ণতার মধ্যেই যেন হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে মণীশ বলল—"চল রুণাদি, যাবে এবার?"

গেটের দিকে এগুল ওরা।

খানিকটা এগিয়ে, একটা বেঞ্চের কাছে এসে অরুণা বলল— "আর একটু বসবে না? চমৎকার রাত্তিরটি।"

বেঞ্চটাতে বসল তিন জনে। একটু পরেই অরুণার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বলল—"এই দেখ আক্কেল আমার! ঠাকুরের সেই ঘ্যাট-চচ্চড়ি খেয়ে কাটাতে হবে এদের। আমি একটু উঠি মণীশ! তোমরা ব'সোই বরং খানিকটা না হয়। আহা, মালা এসব জায়গা কখনও দেখে নি—রোজ তো আসা হচ্ছে না।···কি লো?"

মণীশ বোধহয় বুঝে থাকবে; মালা কিন্তু যে বুঝল না তা তার মুখের সহজ আনন্দের ভাবেই টের পাওয়া গেল। হেসে ঘাড় কাৎ করল।

নরু ঘোড়া নিয়ে রয়েছে, সিপা ফরমাশ খাটছে।

গেটের কাছে গিয়েও অরুণার আচমকা মনে পড়ে গেল—ঐ বেঞ্চটায় বসেই না সেদিন মালার জন্যে মণীশের কাছে অ্যাপীল করেছিল—প্রায় হাত ধরেই?···ভালোই হোল।···ঐ বেঞ্চটাই তো।

আর এক বার অচলনাথকে মাঝখানে টেনে আনল অরুণা। সেই রাত্রেই—

ওরা ফিরে এল। খাওয়া-দাওয়ার পরও অনেকক্ষণ ধরে গল্প হোল। তার পর একসময় মালার প্রসঙ্গেই অচলনাথ হঠাৎ বললেন—"হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়ে গেল। বলছিলুম—তোমার তো এখন ছুটি মণীশ, মালাকে যদি এই সময় একটা ইন্‌টেন্‌সিভ কোচিং

দিয়ে দিতে পার ঐখানে থেকে তো বড় ভালো হয়। আমার ইচ্ছা আছে পরে অরুণার মতন ওকে এখানে রেখেই পড়াব—অবশ্য এক-আধ বছরে হবে না বোধ হয়, তবু চেষ্টা করতে দোষ কি? পারবে দিতে সময়?"

কে এর পেছনে আছে বুঝতে বাকি রইল না,—মণীশের দৃষ্টিটা যেন অবাধ্যভাবেই অরুণার মুখের ওপর গিয়ে পড়ল। অরুণা, বুঝেসুঝেই আগে থেকে তার দৃষ্টি নত করে নিয়েছে।

স্টেশনে গিয়েছিল। গাড়ি ছাড়বার মুখে মণীশকে মনে করিয়ে দিল—"কথা দিয়েছিলে মালার কথা কখনও ভুলবে না।"

এবার হাতটা ধরেই মনে করিয়ে দিল। তবে ঘাড়টা গেল একটু ঘুরে।

নিজের সংকল্পে আবার ফিরে এল অরুণা।

১৮

এগিয়ে চলল।

নিজের ওপর কঠোর হয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখতে থাকে—দুটিতে পরস্পরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সুযোগ খোঁজে, আরও নিবিড়তর করে আনবার জন্যে দুজনকে দুজনের কাছে। কঠোর শাসনে নিজেকে ওদের মাঝখান থেকে সরিয়ে আনছে, ধীরে ধীরে অবলুপ্ত করে দেবে একেবারে।

কমিয়ে আনল নিজের গ্রামে আসাটা। প্রশ্ন উঠলে তার উত্তর আছে; পরীক্ষার বছর। পরীক্ষা যত দূরেই থাক, এগিয়ে তো আসছেই, সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা জোরালো হয়ে উঠছে। বাড়ির তাগাদা কমে আসতে হচ্ছে বাধ্য। শুধু, একটা যে পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অরুণা, আর সেটা যে তিলে তিলে দগ্ধ করা অগ্নিপরীক্ষাই, এটুকু আর কেউ জানতে পারছে না।

আরও এগুল। একবার মাস দেড়েক বাড়ি এল না, তার মধ্যে শেষের দিন-পনেরো কোন চিঠিও নেই। তার পর, যখন বাড়িতে উদ্বেগটুকু বেশ চরমে, সেই সময় এল দুখানা চিঠি।···একখানা ষষ্ঠীচরণকে। ভালোই আছে দুজনে, তবে সামনের দুটো সপ্তাহও পারবে না আসতে। নরু, সিপ্রা এদের দেখবার জন্যে মনটা বড় উতলা হয়ে রয়েছে, পারবেন কি একবার মণীশের সঙ্গে একটা দিনের তরে পাঠিয়ে দিতে? তা হলে মালাও যেন সঙ্গে আসে, তাকেও অনেকদিন দেখে নি।

পুনশ্চ। ওদের যেন প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট করে পাঠিয়ে দেন। সকালেই আসবে তো, ও-সময়টা ডেলি-প্যাসেঞ্জারের বড় ভিড়; ছোটরা সঙ্গে থাকবে, কষ্ট হবে।

দ্বিতীয় চিঠিটা মণীশকে লেখা।

সেটা একবারে হোল না, একবার লিখে ছিঁড়ে ফেলে' আবার নতুন করে লিখতে হোল। ওতেও নরু, সিপ্রা আর সবার সঙ্গে মালার কথা লেখা ছিল; তবে শেষের দিকে কতকটা যেন ভুলের মতোই কি করে একটা লাইন যে এসে পড়েছিল বুঝতে পারল না অরুণা। লিখেছিল—নিশ্চয় যেন আসে মণীশ, নয়তো কলকাতার পথঘাট ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

অগ্নিপরীক্ষা বৈকি; আগুনের প্রথম দাহন হোল ওদের দুজনের চেহারা, মণীশের আর মালার—যখন ওরা এল গ্রাম থেকে। বিয়ের জল গায়ে পড়লে এই রকমটা হয়ে পড়ে হঠাৎ; মেয়েছেলেই তো অরুণা, অনেকক্ষেত্রে লক্ষ্য করে দেখেছে এর আগে। শুনেছে এমন একটা আনন্দের বান নাকি ডেকে যায় দুজনের মধ্যে যার তুলনা অন্য কোথাও নেই। কথাটা শুনেছে তার এক সইয়ের মুখে, যখন সে প্রথম স্বামী-ঘর করতে গিয়ে মাসখানেক পরে ফিরল।

বেশ অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল অরুণাকে, যার জন্যে প্রথম অভ্যর্থনাটা ঠিক সে-রকম বুক পেতে দু বাহু বাড়িয়ে দেওয়ার মতো

হোল না। অথচ এবারে মণীশ দলটি আরও পুরু করেই এনেছে। নরুর ওপরের বোনটি আছে, ষষ্ঠীচরণের ভাই করালীচরণের স্ত্রী ইতিমধ্যে বাপের বাড়ি থেকে গ্রামে এসেছে, তাদের ছেলেটি এসেছে, একেবারে ছোটর দিকে প্রায় সবাই। খুবই চালাক মেয়ে, সামলেই নিল অরুণা, তবু কয়েক সেকেণ্ডের জন্য একটা যে ছন্দ-পতন হয়েই গেল, সেটা অন্তত তার নিজের কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে রইল।

বড় অপরূপ হয়ে উঠেছে এই কটা দিনে; মণীশ আর মালা, দুজনেই।

ব্যাপারটা সামলে গেল আরও এক কারণে, মণীশ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজের বাড়ি কালীঘাটে চলে গেল।

ওর বাড়ির বাঁধন খুবই শিথিল। সংসারটা ওর বড় ভাইয়ের, সে বৈমাত্র। বিমাতা অবশ্য ভালো, কিন্তু তিনি একরকম চিররুগ্ণা। গৃহের কর্ত্রী মণীশের ভ্রাতৃজায়াই। একটু অন্য প্রকৃতির মানুষ, শাশুড়ী আমল পান না। এই সব কারণে ঘরের চেয়ে বাহিরই মণীশের কাছে আরও এত সহজে আপনার হয়ে যেতে পেরেছে। দূর-সফর থেকে ফিরে—যেমন, যখন দেওঘর থেকে ফিরে এল, ও সমস্ত দিনটাই হোস্টেলে কাটিয়ে বাড়ি গেছে, আজ কিন্তু ওখান থেকে কী মন যে নিয়ে এসেছে, যেন দাঁড়াতে পারছে না অরুণার সামনে। একটু চাও খেল না। ওরা এল চারটের সময়, অচলনাথ তখনও আসেন নি কলেজ থেকে, তবুও অপেক্ষা করল না, বলল বাড়ি থেকেও একটা জরুরী চিঠি গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখবে কথাটা কি।

সত্য কি মিথ্যা সেই জানে।

অরুণা একটু কামড়ও দিল, "সে জানি, নৈলে তুমি যে অন্য কারুর তাগাদায় ছুটে আসবার লোক নও সেটুকু আমার বিলক্ষণ জানা আছে।"

"না রুণাদি, যা দিব্যি গালতে বল।...দেখো, কাল সকালেই

চলে আসব। এখানে খাব। আর বেড়াবার একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে রাখবে…”

বাড়ির চিঠিটা বোধহয় বানানো কথাই, আরও যেন বিব্রত হয়ে পড়েছে।

অরুণা আর জিদ করল না। সেও তো আপাতত বাঁচলই। শুধু একটা প্রশ্নের লোভ সংবরণ করতে পারল না। মালা ছেলেমেয়েদের জুতা-জামা ছাড়িয়ে গুছিয়ে রাখছিল, জিজ্ঞেস করল, “হ্যাঁ রে, সত্যিই মণীশের বাড়ি থেকে কোন চিঠি গিয়েছিল নাকি?”

বেশ সরল বিস্ময়েই মালা ঘুরে চেয়ে বলল, “জানি না তো আমি।”

“নাঃ, তুমি কিচ্ছু জান না!”

এটুকু যেন আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, অবশ্য হাসি-হাসি মুখ দিয়েই।

মালা হাত থামিয়ে আরও বিস্মিত হয়ে চাইল, বলল, “বাঃ রে, আমি কি করে জানব!”

মুখে একেবারেই শিশুর সারল্য। বুকের মমতা টেনে বের করে, যেন একটা শিশুর প্রতিই।

এর পর আবার সব বেশ সহজ হয়ে এল অরুণার। ওদের জন্য খাবার তৈরী করা, তার মধ্যে গল্প-সল্প। অচলনাথও এসে পড়লেন। ছোট বেলা, কেটে যেতে দেরি হোল না। সন্ধ্যা হতে সবাইকে নিয়ে একটু বেরিয়েও পড়ল। একটা ভালো মনোহারী দোকানে গিয়ে ওদের চার জনের জন্য পছন্দ করিয়ে করিয়ে খেলনা নিল; টফি, লজেঞ্জ, বিস্কুট নিল, তার পর মালার জন্য একটা কিছু পছন্দ করে ফরমাশ দিতে গিয়ে হঠাৎ অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়ে যেতে নিরস্ত হয়ে বলল, “এবার তুই কি চাস মালা, নিজে পছন্দ করে বল্।”

মালা কুণ্ঠিত হয়ে উঠল। ওর যেমন স্বভাব, মনে কোন

প্রত্যাশাও ছিল না, ছেলেমানুষদের নিয়ে আসা হয়েছে, কেনা হয়েছে তাদের জন্য, আর কি? বলল, "আমার আবার কি নেবে রুণাদি? কচি খুকি নাকি?"

লম্বা কাউণ্টারের একেবারে শেষের দিকটা নিয়ে ওরা দাঁড়িয়েছে—মালা, অরুণা, তার পর ছেলেমেয়েরা। খেলনা-টয়লেটের বিভাগ, এর পরেও জন-চার মেয়েই, প্রায় মালা-অরুণার বয়সীও। বলার বেশ সুবিধা আছে, তবু ওরই মধ্যে গলাটা একটু খাটো করে নিল অরুণা। মালার কথার উত্তরে বলল, "না, খুকি কে বলছে? বুড়িই তো। ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছিস—তাহলে চল্ একটা দশকর্মের দোকানে যাই, একটা তুলসীর মালা, নামাবলী আর কুশাসন কিনে দিই গে।"

ওদের পাশেই যে মেয়েটি ছিল, মুখ টিপে হেসে আড়চোখে একবার চাইল ওদের দিকে।

অরুণা মালার পিঠে বাঁ হাতটা রাখল, বলল, "না মালা, পাকামি করিস্ নি, কর্ পছন্দ একটা কিছু। মনে আছে, একদিন বলেছিলি পরে চাইবি কোনদিন? এমন সুবিধে আর কবে পাবি?"

লজ্জায় হাসি-হাসি মুখটা নত করেই রইল মালা।

"কর্ পছন্দ একটা কিছু মালা, না হয় মনে কর্ রুণাদিরই সাধ একটা।"

চোখটা তুলে একটু হাসল মালা, বলল, "তোমার সাধ তো তুমিই পছন্দ করে দাও তাহলে।"

"সে ঠিক হয় না।"

"খুব হয়।"

অরুণা তর্কটা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। চোখ তুলে কি একটা ভেবে নিয়ে, ঠোঁটের কোণে খুব সূক্ষ্ম একটু হাসি টেনে এনে বলল, "বেশ, তাহলে আমার পছন্দেই হবে তো? যা হাতে তুলে দোব, নিবি?"

সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে দোকানীকে ডাক দিল, "শুনুন।" এগিয়ে এলে, বলল, "একটা টয়লেট-বক্স্, সবচেয়ে যা ভালো আছে।"

বোধহয় ব্যাবসায়িক অভ্যাসেই দোকানীর দৃষ্টিটা দুজনের কপালের ওপর বুলিয়ে গেল। চলে গেল আনতে।

মালা প্রশ্ন করল, "সে আবার কী রুণাদি ?" নিশ্চয় ওর হঠাৎ এই ভাব-পরিবর্তনে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছে। অবশ্য চাপা গলাতেই করল প্রশ্নটা, তবু পাশের মেয়েটির চকিত দৃষ্টিটা আবার ঘুরে গেল একবার, কান পেতে রয়েছে।

অরুণা বলল, "দেখবিই তো।"

দোকানী দুটো বাক্স নিয়ে এল প্রসাধনের। অরুণা টপটপ করে ডালা খুলে কী যেন একটা দেখে নিয়ে দুটোই ঠেলে দিয়ে বলল, "না, কম্‌প্লিট (complete) দিন।"

আবার দুটো এল। অপেক্ষাকৃত ভালোটার সেইভাবে টুপ করে ডালা খুলে আবার টিপে দিয়ে বলল, "ঠিক আছে, মেমো করুন।"

পাশের মেয়েটির চকিত দৃষ্টি একবার যেন বিশেষ করে মালার কপালের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। খুব সূক্ষ্ম একটু হাসি ঠোঁটের এক দিকে।...গল্পটা পুরো করে নিয়েছে।

বেরিয়ে ফুটপাতে এসে অরুণা যেন জ্বালাতন হয়ে বলল, "ক্লি গেরো বল্ দিকিন, বুড়ো ধাড়ী টয়লেট-বক্স্ মানে জানে না! হ্যাঁরে, ঠিক করে বল্ দিকিন, মণীশ তোকে সত্যিই পড়ায়, না..."

চুপ করে গেল; সিপ্রা কৌতূহলী হয়ে মুখ তুলে চেয়েছে। গরগরই করতে লাগল কিন্তু অরুণা, "আর সেই পাশের মেয়েটা!... এ রকম অনেক পাড়াগেঁয়ে ভূত আছে, তাতে তোর কি বাপু?... অসভ্য কোথাকার! একটু যে দেখেশুনে কিনব, কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে!...কে কি বলে শুনতে হবে, কে বোকার মতন হাঁ করে রয়েছে দেখতে হবে..."

মালা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল, সুবিধাটা পেয়ে বলল,

"বেশ আছি বাপু, অমন অসভ্য হওয়ার চেয়ে চিরজন্ম বোকা হয়ে থাকি সে ভালো।"

অরুণাও মনটা ঘুরিয়ে আনল, বোধ হয় হুঁশ হোল লজ্জায় পড়ে গেছে মালা।

বলল, "সেকথা ঠিক বলেছিস মালা। কী যে ভাবে কলকাতার এ মেয়েগুলো নিজেদের! টয়লেট-বক্স বোঝে না, ব্যস, সে আর তো মানুষ নয়। ওঁরা যে ও ভিন্ন আর কিছু বোঝেনই না সেদিকে হুঁশ নেই! অন্তত একটা ভদ্রতা-জ্ঞান তো থাকবে লোকের, কে কি বলছে না-বলছে শোনা আর ফিক-ফিক করে হাসা। ইচ্ছে হয়…"

"একটা কথা বলি দিদি?"

ছোট বোনের মতোই আবদারে কাঁচুমাচু হয়ে গায়ের কাছে একটু ঘেঁষে এসেছে; অরুণা দাঁড়িয়ে পড়েই বলল, "বল্ না।"

হোস্টেলের কাছে এসে পড়েছে, মালা আরও কুণ্ঠিত হয়ে বলল, "পার্কে একবারটি যাবে না? কাছেই তো।"

সামান্যই একটা আবদার, কিন্তু ঐটুকু জানাতেই কী যে একটা ফুটে উঠল মুখে, স্নেহের একটা ঢল্ নামিয়ে দিল যেন অরুণার বুকে। সামান্য ব্যাপারটুকুকে যথাসাধ্য বড় করে তুলে বলল, "ঠিক বলেছিস রে মালা, আমার খেয়ালই হয় নি। চল্, চল্, বরং আগেই ঘুরে আসি। মনটাও ঠিক হয়ে যাবে, যা খিঁচড়ে দিয়েছে মেয়েটা!"

আলো দেখেই একটা খালি বেঞ্চের ওপর গিয়ে বসল দুজনে। ওরা চার জনে একটু সরে ঘাসের ওপর নূতন খেলনা নিয়ে খেলতে লাগল।

একটু এ-গল্প সে-গল্পের পর অরুণা হঠাৎ বলল, "তোর বাক্সটা নে এবার মালা, আমি মিছে বইছি।"

মালা বলল, "বাড়ি গিয়েই নোব দিদি।"

অরুণা ওর পিঠে স্নেহভরে একটু চাপ দিল, বলল, "না, এইখানেই নে। এই ধর্।"

একটু যেন আবিষ্ট হয়ে পড়েছে।…এইখানেই না ওরা সেদিনও তিন জনে এসে বসেছিল ? ও, মালা আর মণীশ। তার পর এই বেঞ্চেই মালাকে আর মণীশকে বসিয়ে রেখে চলে গিয়েছিল না অরুণা ?

কথাটা বলবার জন্যেও যেন জিভ চুলকায় ; কিন্তু আজ যথেষ্ট লজ্জা পেয়েছে মালা, এই একটু সামলেছে, আর বাড়াল না।

বাক্সটা বন্ধই দিতে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে বলল, "দাঁড়া, দেখি কি কি আছে, দেখাও হয় নি ভালো করে তখন। এই দেখ্, এটা পাউডার লাগাবার পাফ্, এটা কাজলের…

"ওটা কি দিদি ?"

একটু আড়চোখে আরম্ভ করে সোজা হয়েই দেখছিল মালা, রুপার ওপর মীনা করে 'সাবিত্রী' লেখা একটা ছোট কৌটা তুলে নিল। নিজেই বলল, "এ তো সিঁদুর-কৌটো! না, এ আমি নোব না।"

"কেন নিবি নি ? ওতে তো সিঁদুর নেই। বাক্সে একটা করে থাকে।"

"না, কোনমতেই নেব না।" বেশ জোর করেই দুলিয়ে দিল মাথাটা মালা। "সব বাক্সে থাকে না। এবার বুঝেছি তোমার দুষ্টুমি। আগেরটায় ছিল না, তাই তুমি ফিরিয়ে দিলে, আমি কম্প্লিট্ মানে যেন জানি না! এবার বুঝেছি।"

কোনমতে নেবে না।

বুকের সেই ঢল্‌টা আরও বেড়ে যাচ্ছে, কোন্ কোন্ উৎস-মুখ যে দিচ্ছে খুলে। অরুণা একটু এগিয়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরল, বলল, "নে মালা, আমি বলছি, আজ দরকার নেই, কিন্তু হবেই তো, তার দেরিও নেই…"

একেবারে ঘুরিয়ে নিল মুখটা মালা।

"আচ্ছা আচ্ছা, বলব না…"

"বলবে না কেন, বল। তাহলে আমিও তো বলতে জানি।" ঝগড়ার ভাব এনে ফেলল মালা।

অরুণা ওর মুখখানা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ধরল, একটু চেয়ে থেকে বলল, "বেশ, বল্ না।"

মালা একটু জোর করেই ছাড়িয়ে আবার ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "তাহলে দিদিই তো তুমি, যা বললে সে তো আগে তোমারই; তুমিই নাও।"

"এই তো, কে বললে মালা কথা কইতে জানে না।"

হাতে ওর মুখখানা ধরেই রয়েছে, একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "বেশ, আমিই নিলুম, ধর আমারই জিনিস, তা যতদিন কিছু না হচ্ছে বাক্সে গচ্ছিত রাখতে আপত্তি আছে?"

"সে আপত্তি কেন থাকবে।"

আবার মুখটা ঘুরিয়ে নিল অরুণা, হাতের একটু চাপ দিয়ে নিজের মুখটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল—"তার পর, যার আগে হয়, তারই। কেমন তো?"

মালা বলল—"ছ্যাখো, আবার সেই দুষ্টুমি!"

১৯

এই তো পারছে অরুণা। এমন কি শক্ত?

এই যে মালার মনে রঙের ছোপ, সে তো সে-ই ধরিয়ে দিল! তার পর এই সিঁদুর-কৌটো। রং ধরানোর কথায় আসতে গেলে, ভরার চেয়ে, আসবে সিঁদুর, ভরিয়ে দেবে কৌটো—এইতেই কি বেশী করে রাঙিয়ে দেয় না মনটাকে? থাক্ ওটা চোখের সামনে, স্বপ্ন দেখুক মালা।

পরের দিন নিজে স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে ওদের গাড়িতে তুলে দিয়ে এল। একটা উদ্দেশ্য ছিল।

আসার সময় অত করে লিখে দেওয়া সত্ত্বেও থার্ড ক্লাসেই এসেছে মণীশ, হয়তো ওদের পয়সা বাঁচাবার জন্যই; কিংবা এও হতে পারে,

হয়তো অরুণার উদ্দেশ্যটা বুঝে গিয়ে থাকবে। এবার মোটর থেকে নেমেই অরুণা বলল, "তুমি ওদের নিয়ে তাড়াতাড়ি গাড়িতে বসে পড়ো গে মণীশ, আমি টিকিটগুলো কিনে আনি।"

কিছু বলবার আগেই কাউণ্টারে গিয়ে টিকিট কাটিয়ে নিয়ে এল। সেকেণ্ড ক্লাসেরও নয়, একেবারে ফার্স্ট ক্লাসের। তখন পুরানো বন্দোবস্তে সব ক্লাসই রয়েছে। মণীশ দাঁড়িয়েই ছিল সবাইকে নিয়ে, ও এলে প্রশ্ন করল—"ওটা কি হোল ? না, পালটে নিয়ে এস রুণাদি, থার্ডেই যাব, অযথা কতকগুলো পয়সা কোম্পানিকে দেওয়া।"

অরুণা ওদের ছাড়িয়ে গটগট করে এগিয়ে গেল, তার পর ঘুরে বলল, "তাহলে তুমি থাক। আমিই রেখে আসছি ওদের। এখন ফিরতি ডেলি-প্যাসেঞ্জারের ভিড় ; দিদির কাছে, পিসির কাছে এসে চাপে সারা হোক আর কি সবাই !···তোরা আয় রে সব।"

মণীশ একটু পরাজয়ের হাসি নিয়ে এগিয়ে এল, বলল, "বরাবর নিজের জিদ নিয়েই রইলে তুমি রুণাদি।"

অরুণা বলল—"এটুকু বরাবর যদি মনে রেখে যাও তো আর গোল থাকে না।"

মণীশের কুণ্ঠিত দৃষ্টিটা আর একবার ওর মুখের ওপর যেন না এসে পড়ে পারলই না।

সবাই উঠে বসল গাড়িতে। একটু গল্পগুজব হোল, ছাড়ার ঘণ্টা দিলে নেমে এসে দাঁড়িয়ে রইল অরুণা।

দাঁড়াল মালার কাছেই, কেন না সে-ই দোরের কাছটায় বসে ছিল ; তার পর ছেলেমেয়েরা, তার পর কোণ ঘেঁষে মণীশ।

ইঞ্জিনের হুইসিলের সঙ্গে গাড়িতে টান পড়তে মালা অরুণার হাতটা চেপে ধরে বলল, "শীগগির আসবে দিদি, নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

"দ্যাখো বোকা মেয়ে, খাল কেটে কুমীর ঢোকাতে চায় ঘরে !" একটু হেসেই বলল অরুণা।

"কি বললে···খাল কেটে ?···"

মালার প্রথম কথাতেই মণীশের হঠাৎ মুখ নামিয়ে নরুর সঙ্গে গল্প করা দরকার হয়ে পড়েছিল, যেন অবাধ্যভাবেই মুখটা উঠে গিয়ে দৃষ্টিটা চকিতে অরুণার মুখের ওপর পড়ল।

তখনই অবশ্য নামিয়ে নিল। অরুণা মালার কথার উত্তর দিল, "বলছিলুম, আমি গেলে তোর পড়ায় তো খানিকটা ব্যাঘাত হবেই। ···খুব মন দিয়ে পড়বি মালা।···মণীশ, নজর রাখবে।"

ছেড়ে আস্তে আস্তে গড়িয়েই যাচ্ছিল গাড়িটা, অরুণাও এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছিল, এঞ্জিনটা একটা শব্দ করে গতিবেগ দিল।

দাঁড়িয়ে পড়ল অরুণা। মালা, সিপ্রা হাত নাড়ছে এদিকে চেয়ে, অরুণাও মুখে একটু হাসি নিয়ে হাতটা তুলে আস্তে আস্তে দোলাতে লাগল, তার পর হাসিটা উদ্গত অশ্রুতে ডুবে এলে মুখটা ঘুরিয়ে গেটের দিকে পা বাড়াল।

মণীশের তখনও নরুক সঙ্গে শেষ হয় নি কথা।

এই তো বেশ পারল অরুণা, কী আর এমন শক্ত ব্যাপার ?

যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণই মণীশ ওধারে আর মালা এধারে, মাঝখানে ওরা চার জন। যেন কতবড় এক দুরতিক্রম্য বাধা!··· এর পরে দুটিতে পাশাপাশি হবে, মন-স্থির করে উঠতে খুব বেশী দেরি হয় তো একটা স্টেশন পর্যন্ত।

তা হলেই তো অরুণার উদ্দেশ্য সিদ্ধ.হোল। পাশাপাশি এনে ফেলবার জন্যেই তো এত হাঙ্গাম করে ফার্স্ট ক্লাসের নিরিবিলি সৃষ্টি করা।

গলার মধ্যে একটা টনটনানি রয়েছে যেন, যাতে অশ্রুটা ঠেলে তুলেছিল, তবু বিজয়ের একটা উল্লাসও তো আছে, যত ক্ষীণই হোক তা; অরুণা সেইটুকুকে বুকে আঁকড়ে ধরে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

বাড়িয়ে তোলবারও চেষ্টা করতে লাগল সেই ক্ষীণ উল্লাসটুকুকে। ও জানে কি করে পাশাপাশি হবে দুজনে, কি করে হয়। কতবার তো এল-গেল একসঙ্গে। কোনও একটা প্রসঙ্গ উঠবে আলোচনার। মণীশই তুলবে, বেটাছেলেরাই সাধারণত তোলে। ওর বেলায় প্রায় আরম্ভ হত সমাজ, রাজনীতি, কলেজ এই সব নিয়ে। যত সব সমস্যার কথা, প্রয়োজনের কথা; কিন্তু প্রায় দেখা যেত, কখন্ সে-সব মিটে গিয়ে অপ্রয়োজনের কথায় নেমে এসেছে ওরা; পথ, ঘাট, জঙ্গল, মাঠ; গোরু ছেড়ে দিয়ে দুটি ছেলে বাবলা গাছের হালকা ছায়ায় আছে বসে; গাড়ির আওয়াজ শুনে দুটি মেয়ে ঘরের দোরগোড়ায় এসে থমকে দাঁড়াল; গাড়ির দু ধারে অপস্রিয়মাণ অতি সাধারণ দৃশ্য সব, কিংবা নিত্য-জীবনের অতি সাধারণ টুকরা-টুকরা।·· কিন্তু আশ্চর্যের কথা, কী অসাধারণই না হয়ে ওঠে এই-গুলো!···গাড়ি করে সহায়তা, চলার বেগে একটা রুক্ষ আওয়াজ তুলে বলে, কাছাকাছি হয়ে ব'স তোমরা, নইলে শুনতে পাবে কি করে পরস্পরের কথা?···

মালাকে পাশে বসিয়ে ছবির পর ছবি এঁকে চলল অরুণা।··· ছেলেমেয়েরা যেন চলে গেছে ওদিককার বেঞ্চে।·· এতক্ষণ ওরা অমুক স্টেশন পেরিয়ে হয়তো অমুক স্টেশনের কাছাকাছি হতে চলেছে। ধানের সেই প্রকাণ্ড ক্ষেতটা—ওদিকে, অনেক দূরে, নারকেলগাছের মাথার কাছাকাছি অনেকখানি বড় হয়ে নেমে এসেছে সূর্য, চারিদিকের সবুজের ওপর হলদে আভার একটা কুয়াশা পড়েছে ছড়িয়ে···

"আচ্ছা, তোমার সূর্যাস্ত কেমন লাগে মালা?"

মণীশ জিজ্ঞেস করছে। মালার সঙ্গে নিশ্চয় রাজনীতি, সমাজ-নীতি নিয়ে আলোচনা নেই। অর্থাৎ সময় নষ্ট হয় নি একটুও; এই সব তুচ্ছ, অপ্রয়োজন নিয়েই ভরিয়ে তুলছে এই ঘণ্টা দুয়েকের প্রতিটি মুহূর্ত মণীশ। মালা বলল, "বেশ তো লাগে!"

বেচারী মালা। এমনভাবে বলল যেন সূর্যাস্তটা চৈত্রমাসের

কাঁচামিঠে আম, নুনে জারানো ; কিংবা নূতন বর্ষায় উঠানে দাঁড়িয়ে গা পেতে ভেজা…অরুণার নিজের কথা মনে আছে, একেবারে উচ্ছ্বসিতই হয়ে উঠেছিল ;—

"চমৎকার লাগে মণীশ। বিশেষ করে এতগুলো দিন কলকাতায় কাটাবার পর। আরও ভালো লাগে বোধ হয় এইজন্যে যে সূর্যাস্তের সময় কেমন একটা বিষণ্ণতা নেমে আসে চারিদিকে—বিদায়ের বিষণ্ণতা। ঠিক এইজন্যেই ছাখো—আর সব দিক দিয়ে অনেকটা একরকম হলেও সূর্যোদয়ের সঙ্গে সূর্যাস্তের একটা……"

এই পর্যন্ত। সূর্যাস্ত দেখতে দেখতেই বলে যাচ্ছিল অরুণা, হঠাৎ চোখ ঘুরিয়ে ছাখে মণীশ একটা অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে ঠায় চেয়ে আছে মুখের দিকে ; অদ্ভুত একটা হাসি, সূক্ষ্ম অথচ যেন প্রাণে-ভরা। নিশ্চয় ওর জড়োসড়ো ভাবটা লক্ষ্য করেই মণীশ তাড়াতাড়ি সামলে নেওয়ার জন্যে বলল, "তা তো বটেই। Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts (বিষাদ-সিঞ্চিত যে গান সেই তো সবচেয়ে মধুর গান)।

এর পর হঠাৎ ও-প্রসঙ্গ বন্ধ হয়ে যায় সেদিন, অত সহজে সে কুণ্ঠা, সে জড়োসড়ো ভাব কখনও কাটে ? নিজের মনের চিন্তা নিয়ে অনেকক্ষণ কেটেছিল অরুণার। কে জানে, মণীশের মনে তখন সে কী চিন্তার ঢেউ !

মালার এ বেশ হোল। না বোঝার অনেক সুবিধা তো, উভয়-পক্ষেই। মণীশ অনেকক্ষণ বোঝাতে পারবে, অনেকক্ষণ চালাতে পারবে আলোচনাটা ; সৌন্দর্যতত্ত্বটা কি ; কেন, কখন আমরা প্রভাবিত হয়ে পড়ি বেশী, হয়তো অরুণার সেদিনকার কথাটাই এনে ফেলে উদয়রাগ আর অস্তরাগের প্রভেদটা বোঝাবে, হয়তো Shelleyর ঐ লাইনটা তুলে দিয়ে তার মানেটা নিয়ে পড়বে। তার পর আরও কবিদের ফেলবে এনে।

না বোঝার সুবিধা যে অনেক। সেদিন বেশী বোঝার জন্য বেশী উচ্ছ্বসিত হয়ে থেমে যেতে হয়েছিল অরুণাকে, প্রসঙ্গ গিয়েছিল বন্ধ

হয়ে। আজ উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়বে মণীশ। মালা এবার অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে মুখের দিকে। প্রসঙ্গটা অবসরই পাবে না বন্ধ হয়ে যাওয়ার।

অরুণাই যেন হয়ে গেছে মালা; চেয়ে আছে মুখের পানে, উচ্ছ্বসিত মণীশের যা কিছু মুদ্রাদোষ (বা মুদ্রা-মাধুর্য) সব কিছুই ভেসে ভেসে উঠছে চোখের সামনে।

ঠিক সন্ধ্যার মুখে নামল ওরা তুজনে গাড়ি থেকে—মালা, মণীশ আর চারটি ছেলেমেয়ে নয়; যেন শুধু মণীশ আর অরুণা। বাড়ি চলেছে হন হন করে। এখানে নেমে আবার রেলের কামরাটা মুছে ফেলতে হবে তো।...যেন পুকুরটার সামনে এসে থমকে পড়ল অরুণা, বলল, "কৈ, আজ যে তোমার মালা ঘাটে নেই মণীশ!"

কেটে গেছে চমকটা।

মালা যে মণীশের সঙ্গেই। সব আগে মণীশ আর সিপ্রা, ওদের পেছনে মালা আর বাকি তিন জন।

২০

রাত পর্যন্ত এই ভাবেই চলল যতক্ষণ জেগে রইল, তার পরে স্বপ্নের মধ্যেও খানিকটা; পাশাপাশিই রয়েছে ওরা, তবে কখনও মালা মিলিয়ে গিয়ে অরুণা, কখনও আবার অরুণা মিলিয়ে গিয়ে মালা।

এই কি বিজয়ের লক্ষণ?

পরদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে অনেক দেরি হয়ে গেল। ঘুম অনেকক্ষণই ভেঙে গেছে—ঠিক বলতে গেলে বরং ঘুম আসেই নি সমস্ত রাত, যতক্ষণ জেগে ছিল, জেগেই ছিল যখন স্বপ্ন দেখেছে তখন সে-স্বপ্ন এত বাস্তব-সমতুল যে তা জেগে থাকারই মতো,—পড়েই রইল বিছানায় অনেকক্ষণ। মনে একটা অপরিসীম শ্রান্তি, দেহে এমন একটা জড়তা ছেয়ে রয়েছে যে উঠবে কি বিছানা ছেড়ে,

পাশ ফিরে শোবে সে সামর্থ্যটুকু পর্যন্ত নেই।···মনটা পাষাণ করতে গিয়ে শরীরটাও কি পাষাণ হয়ে গেল অরুণার? নিজের মনেই একটু হেসে এক সময় উঠে পড়ল।

কাজে একেবারে মন বসাতে পারছে না। ঐ একটা প্রশ্ন আকারভেদে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যেন সব-তাতেই বিভ্রম ঘটাচ্ছে—ও কি সত্যই জিতল, না শুধু একটা আত্মপ্রবোধ এটা? পারবে কি চালিয়ে যেতে শেষ পর্যন্ত?

"তোমার শরীর ভালো নেই নাকি মা? দেরি হোল যে উঠতে এত?"

অচলনাথ ওদিকে কোথা থেকে এসে প্রশ্নটা করলেন। বাইরে কোথাও যান নি, কেননা চটি পরেই রয়েছেন। ধাক্কাটা খেয়ে সম্বিৎ ফিরে এল অরুণার। বলল, "আপনার চা খাওয়া হয় নি তো মেজো-জ্যাঠামশাই?"

এ এক ধরনের প্রশ্ন যার উত্তরটা জানাই। অরুণা উঠবে, চা করবে, তবে তো খাবেন।

অচলনাথ বললেন, "সে হবে। ঠাকুরকে বলে এলুম একটু গরম জলের কথা, ছুটি চা ফেলে তোয়ের করে নোব'খন।··শরীর যদি খারাপ থাকে তো তাড়াতাড়ি উঠতে গেলে কেন মা?"

তীব্র একটা অনুশোচনা, এ রকম কখনও হয় না। অসুখে পড়েও লুকিয়ে রেখে আগে অচলনাথের চা-জলখাবারটা করে দিয়েছে।

এই ধাক্কাতেই বেশ তরতর করে সকালের কাজগুলো সেরে ফেলল এক ঝোঁকে, নিজের স্নান পর্যন্ত। বই নিয়ে বসলও, তার পর থেকেই কিন্তু সেই ঝিমোনো ভাবটা ফিরে এল আবার। বইয়ের পাতায় বাড়ির ছবি ফুটে উঠছে।··সেখানেও মালা পড়তে বসেছে এতক্ষণ। এখানে অরুণা যেমন একলা, সেখানে মালার সঙ্গে মুখো-মুখি হয়ে টেবিলের ওদিকে বসে আছে মণীশ।···যেমন করে অরুণাকে পড়াতে এই টেবিলেরই ওদিকে বসে থাকত।

এর সঙ্গে এসে পড়ছে সেই সব প্রশ্ন। এ টেবিলে বসা ঘুচিয়ে অরুণা তো নিজেই ওকে ও-টেবিলে পাঠিয়ে দিল, কিন্তু পারবে কি শেষ পর্যন্ত? যেটাকে ভাবছে বিজয়, সেটা পরাজয়ের ওপরই একটা কৃত্রিম প্রলেপ নয় কি?

অচলনাথ চলে গেলে খালি ঘরে প্রশ্নটা যেন বিপুলাকার হয়ে উঠতে লাগল। এই যে মস্তবড় চোখ-ধাঁধানো একটা কিছু করতে হবে—বিরাট এক আত্মবলি, এটা কি মনের একটা বিলাস মাত্র নয়? কি প্রয়োজন এর যে মালার হাতে মণীশকেই তুলে দিতে হবে? ওর ব্যবস্থা করছে যথাসাধ্য, তার পর বিয়েরও একটা ব্যবস্থা হবেই, দাদু, জ্যাঠাইমা যখন তুলে নিয়েছেন ভার; হঠাৎ এর মধ্যে অরুণা সবাইকে ঠেলেঠুলে এভাবে দাঁড়াতে গেল কেন?

কলেজে যাওয়া হোল না। একেবারে সর্বনাশের সামনে এসে প্রশ্নটা শেষ উত্তর চাইছে। যুক্তিও সব এসে পড়ছে একেবারে নূতন ধরনের—

শুধু কি একা নিজের সর্বনাশই করতে বসেছে অরুণা? সেই সঙ্গে মণীশকেও কি টেনে আনছে না? অরুণার সম্বন্ধে মণীশের মনের ভাবটা যে কী তা তো জানেই। উৎসাহ পেয়েছে অরুণার কাছে। আজ মালার পাশে যেমন তাকে টেনে আনছে, একসময় নিজের পাশে তেমনি করে টেনেছিল তো? এই ঝড় কি আজ মণীশের বুকের ওপর দিয়েও বয়ে যাচ্ছে না?···

দায়ী তো অরুণাই; পার্কের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আসবে, কলকাতা ছাড়িয়ে গাঁয়ে থাকবার ব্যবস্থা করবে, নিজে টিকিট কেটে গাড়ির মধ্যে করবে নেপথ্য সৃষ্টি। দোষ কি মণীশের? পুরুষ হচ্ছে তার স্বভাবেই দ্বিচারী, দ্বিচারী কেন, বহুচারী; তার সামনে এমন করে এগিয়ে দিলে সে যে কত অসহায় তা তো জানা উচিত অরুণার।

এও বুঝছে যে এসব হচ্ছে যুক্তিমাত্র; অসহায়তা, সর্বনাশ আসলে অরুণারই।

শূন্য প্রকোষ্ঠে নিজের কাছেই প্রশ্নোত্তরে মনটা শেষ পর্যন্ত এক সময় ঘুরে দাঁড়াল। না, হতে দেবে না এ সর্বনাশ, পারবে না, ক্ষমতা নেই ওর এতখানি একটা চমক লাগানো কাণ্ড করার।··· এখনও রাস্তা রয়েছে ফেরবার।

অচলনাথ যখন এলেন, অরুণা শুয়েই ছিল বিছানায়; ওঁর এসে পড়ার কথা, নিজেকে প্রস্তুত রাখবার কথা ভাবতে পারে নি আর কি। তা ভিন্ন এলেনও উনি প্রায় সন্ধ্যার মুখে, একটা মিটিং ছিল বোর্ডের।

প্রশ্ন করলেন, "একি মা, সত্যিই তোমার শরীরটা খারাপ নাকি? ফুকুচ্ছ না তো? কলেজে গিয়েছিলে?"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে অরুণা, বলল, "না মেজো-জ্যাঠামশাই, ভালোই আছি। কলেজে অবিশ্যি যাই নি আজ···"

"তাহলে? ··না, একবার থার্মোমিটারটা লাগিয়ে দেখ। মুখটাও তোমার যেন থমথমে হয়ে রয়েছে। কোথায় থার্মোমিটারটা?"

গুছিয়ে-গাছিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে অরুণা, একটু হাসবার চেষ্টা করেই বলল, "কিছু হয় নি তো শুধু শুধু থার্মোমিটার লাগাতে গেলুম কেন? লাগালে একটু শো (show) তো করেই, তার পর আপনি রাতের খাওয়াটা বন্ধ করুন আর কি।···"

বিপন্নতার মধ্যে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বলল, "একটা দিন হৈ হৈ করে ওরা চলে গেল তো, একেবারেই ভালো লাগছে না।·· তাই ভাবছি একবার না হয় পার্ক থেকে ঘুরে আসি আপনার চা-জলখাবারটা করে দিয়ে।"

সরে পড়তে পারলেই যেন বাঁচে সামনে থেকে।

অচলনাথ বললেন, "তা হলে তাই নিশ্চয়।···না, চা-টা সব হয়ে গেছে মিটিঙেই। তুমি ঘুরে এস খানিকটা।"

পার্কের খোলা হাওয়ায় মনটা বেশ স্বচ্ছ করে দেয়, উদার করে দেয়। দু দিনের কথা মনে পড়ে, দু দিনই মনের একটা অপর্ব

প্রসন্নতায় অরুণা মালাকে এগিয়ে দিয়েছিল মণীশের দিকে। প্রথম দিন মালা ছিল না, অরুণা তার অবস্থার কথা তুলে তার প্রতি অনুকম্পা ভিক্ষা করেছিল মণীশের, তার মানে যা হয়। দ্বিতীয় দিন ছিল মালা, ওরা সেই প্রথম গাঁ থেকে আসে; অরুণা ইচ্ছা করেই ওদের দুজনকে একটা বেঞ্চে বসিয়ে রেখে রান্না তদারক করবার ছুতো করে চলে এসেছিল।

আজ কিন্তু ব্যাপারটা উলটে গেছে। মনে হচ্ছে মালা যেন সেদিন অনধিকার প্রবেশ করেছিল ওর রাজ্যে, যেখানে যাচ্ছে সেদিনকার কোন না কোন একটা স্মৃতি ফুটে উঠছে। কেমন যেন একটা অশুচি বিদ্বেষ—নিজের কাছে নিজেই সংকুচিত হয়ে পড়ছে অরুণা, তবু দৃঢ় করতে পারছে না মনটাকে। ও নিজেই যে নিয়ে এসেছিল মালাকে এ যুক্তিটুকু একেবারেই মনকে শান্ত করতে পারছে না।

যেতে যেতে ঐখানটায় মালা আর মণীশ দুজনে অনেকক্ষণ একত্র হয়ে পড়েছিল, নরুর কাঠের ঘোড়ায় কি একটা গোলমাল হওয়ায় অরুণা যে পেছিয়ে পড়েছিল সেই অবসরে।···ঐ পুকুরটার ধারে রেলিঙে ভর দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ওদের কুমুদ ফুলের আলোচনা হয়েছিল, সেই থেকে মালার মুখ গিয়েছিল খুলে, কবে কোথায় কি সব দেখেছে, এইরকম পুকুর, এইরকম জ্যোৎস্না—মণীশকে বলে যেন কুলিয়ে উঠতে পারছিল না!···ঐ বেঞ্চটায় বসেছিল তিন জনে, শেষে মালা আর মণীশকে বসিয়ে হোস্টেলে ফিরে এল অরুণা···মনে একটা অসহ্য জ্বালা নিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে বেড়াল।···না, পারবে না ও, কোন মতেই পারবে না। মণীশ তার জীবনে নেই এ-কথা একদিনের তরেও ভাবতে পেরেছিল কি করে!

একসময় ফিরল। একটা সংকল্প নিয়ে ফিরছে, এখনই গিয়ে মণীশকে একটা চিঠি দেবে, তার পড়ায় হঠাৎ কতকগুলো সংশয় উপস্থিত হয়েছে, কয়েকদিন লাগবে, সে যেন সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসে।

একটা যে সংকল্প নিয়েই ফিরছে তাতে মনটা অনেকটা যেন শান্ত আছে, তবু খানিকটা এগিয়ে হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল অরুণা।

সেই বেঞ্চটা; রাস্তা থেকে সরে একটু নিরিবিলিতে সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা। আজ নজর পড়তে দ্যাখে একটি যুবা আর একটি যুবতী কতকটা ঘেঁষাঘেঁষি হয়েই বসে গল্প করছে।

মনটা হঠাৎ যেন বিষিয়ে উঠল।

ঐ বেঞ্চে প্রথম দিন ওতে আর মণীশেতে বসেছিল। তার পর থেকেই শুধু ভুল, ভুল আর ভুল। কি হওয়ার কথা, কি হয়ে গেল; শেষ পর্যন্ত মালার হাতে সিঁদুরকৌটো তুলে দেওয়া পর্যন্ত!

একটু সরে গিয়ে একটা গাছের অল্প একটু আড়াল হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল অরুণা। চোখ দুটো যেন জ্বলছে, সেই জ্বালাটা ধীরে ধীরে অধিকার করে ফেলেছে বুকটাকে।···ওরা যেন মণীশ আর মালা।···নাই হোক মণীশ আর মালা, ও বেঞ্চটায় আর কাউকে সহ্য করতে পারবে না অরুণা। একটা অদ্ভুত ঈর্ষা যার কোন অর্থ হয় না, যার কোন অর্থ খোঁজবার অবসরও নেই অরুণার। শুধু—ওখানে ওর স্বপ্ন ভেঙেছে—নিজের হাতেই ভেঙে দিয়েছে অরুণা—কেউ বসে তাদের স্বপ্ন গড়বে, এটা একেবারেই অসহ্য। কেমন যেন একটা আক্রোশই, শুধু ওদের ওপর, কি মালার ওপর, কি মণীশের ওপর, কি এই জড় বস্তুটার ওপর, কি নিজেরই ওপর—যে সবটুকু ঘটালে—এইটে বুঝতে পারছে না অরুণা।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, দুটিতে আরও নিবিড় হয়ে উঠছে, বেশ গলাগলি।···একটা সংকল্প মনে উদয় হয়েছে, শুধু শোভন-অশোভনের কথা ভাবছে অরুণা,—বড়ই বিসদৃশ হয়ে পড়ে, খুব অন্যায়ই, কেউ কখনও কি করেছে এ রকম?

কিন্তু এত জ্বালা—মনটা যেন দ্বিধা প্রশ্নের বাইরে চলে যাচ্ছে। ···পা বাড়িয়ে আবার টেনে নিল একবার, তার পর গটগট করে এগিয়ে গিয়ে বেঞ্চটার এ-প্রান্তে বসে পড়ল।

উল্টো দিকে মুখ করেই বসল, কিন্তু ছন্দপতন যা হবার তা তো হবেই ; একটু নিস্তব্ধতা, তার পর ওরা দুজনে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল।

২১

পার্ক থেকে বেরিয়েই গেল ওরা।

একটু সময় নিল অরুণা ; ততটুকুই যাতে জুড়িয়ে না যায় মনের এই জ্বালাটা। তা হলে আবার কি হবে কে জানে ? বিশ্বাস করে না নিজের মনকে আর।

বাসায় এসেই কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসে গেল। একটানাই গেল লিখে সদ্য সদ্য যা বেরিয়ে এল কলমের মুখে। তার পর চিঠিটা খামে পুরে রাত্রেই কলেজের লেটারবক্সে ফেলে দিয়ে এল।

পরদিনের কথা। ঘুম ভেঙে যেতে বিছানার ওপর বসেই ঘরটার চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল অরুণা। পরশু স্টেশন থেকে ফেরা পর্যন্ত মনটার ওপর দিয়ে একটা খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেছে। ফলে, ঘরটার দিকে আর একেবারেই নজর দিতে পারে নি। রাত্রে যে শুতে গেল তাতেও বিছানাটা একটু ঝেড়েঝুড়ে গুছিয়ে নেওয়ার উৎসাহ ছিল না ; মশারিটা টেনে নামিয়ে না গুঁজেই কোন রকমে শুয়ে পড়েছিল।

তবে একটা কিছু স্থির করে ফেলে আগের রাত্রের তুলনায় ঘুম একটু হয়েছে, মনটা একটু সুস্থ। অবশ্য, একেবারে স্বাভাবিক নয়, এখনও জড়তা লেগেই রয়েছে, তবে ঘরটুকু গুছিয়ে নেওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে, নইলে যেন দিনটা আরম্ভ করতে পারছে না। গা ঘিনঘিন করছে।

উঠে বিছানাটাতেই আগে হাত দিল।

মশারি তুলে চাদরটা ঝেড়ে পাতবার জন্য মাথার বালিসটা

সরাতেই একেবারে স্তম্ভিত, নিশ্চল হয়ে গেল। বালিসের নীচেই সেই মিনার কাজে "সাবিত্রী" লেখা সিঁদুরকৌটা ; রাখা রয়েছে একটা খামের ওপর।

সমস্ত শরীরের রক্তটুকু যেন এক মুহূর্তে নেমে গেল ; কিছু ভাববার কিছু বোঝবার ক্ষমতা হারিয়ে চুপ করে ঐদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল অরুণা। এক সময় অবশ হাতে কৌটোটা সরিয়ে খামটা তুলে নিল। তারই নাম লেখা। খোলা খাম, চিঠিটা বের করে নিয়ে চোখের সামনে ধরল। টেবিলের ওপর হোয়াট-নটে রাখা ওরই খাম আর চিঠির কাগজ বের করে নিয়ে লিখেছে মালা।

এক বার, দু বার, তিন বার পড়ল ; কিছু মানে ধরতে পারছে না, তার পর একবার বাইরের দিকে চেয়ে মনটা যথাসাধ্য গুছিয়ে নিয়ে আবার ফিরে এল চিঠিটায়। বড় চিঠি নয়, সংক্ষিপ্তই। মালা লিখেছে—

দিদি, ছোট বোন বলে আমায় পথ থেকে তুলে নিয়েছ। আমি তার চেয়ে বড় ভাগ্যির কথা ভাবতে পারি না। তুমি তো বড়, বুঝে নিও। আমার শুধু এই ভয় দয়া করে ঠাঁই দিলে উলটে তোমাদেরই না সব্বনাশ করে বসি। তাই এক-এক বার মনে হয় পথের ভিখিরী আবার পথে নেমে গেলে হত। বুঝে নিও দিদি দোহাই তোমার। কৌটো রেখে গেলুম, অপরাধ নিও না।

তোমার ছোট বোন মালা।

অনেক কথা একসঙ্গে এসে মনে যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এক-এক বার মনে হচ্ছে খুবই সরল চিঠি, যা চোখের সামনে রয়েছে তার বেশী কিছু নয়। শুধু কৌটোটা ওকে ফিরিয়ে দেওয়া। আবার পড়ল চিঠিটা।···ও ধারণাটা হয়েছিল মালার সরল মুখখানি মনে পড়ে। কিন্তু যার জীবনে এত বড় একটা বিপ্লব ঘটে গেল, আরও একটা বড় বিপ্লব থেকে যে এভাবে পেল নিষ্কৃতি, সে, বয়স কম বলেই অত সরল হবে কি করে ?—অর্থাৎ অনভিজ্ঞ অর্থে যে সরল।

···তারপর, সব চেয়ে বড় কথা, যার মন ভালবাসার জাদুস্পর্শ পেল, সে পাওয়া যে কী, তাকে হারানো যে কী যে বুঝতে পারল—সে কি করে হবে এই অর্থে সরল? এ স্পর্শ যে একদিনেই অজ্ঞকে করে তোলে অভিজ্ঞ, আলোক বিচ্ছুরিত ক'রে মনের সমস্ত অলিগলি সামনে এনে দেয় ধরে।

ঐ তো স্পষ্ট রয়েছে সর্বনাশ করে বসবার কথা। না, সমস্তটুকু তিলতিল করে বুঝেছে মালা, ঐ একটি কথায় তার সমস্ত মনটিকে মেলে ধরেছে। ভালোই হোল।

অনেকটা সুস্থির হয়ে বিছানার ধারে বসল অরুণা। মনে হচ্ছে কতদিনের গুমোট কেটে গিয়ে হঠাৎ যেন হাওয়া বইল। একেবারেই দক্ষিণা হাওয়া, তাইতেই কোথা থেকে ফিরিয়ে এনেছে তার সিঁদুরকৌটো; তার সঙ্গে এই চিঠি। এবার সুগম হোল অরুণার পথ। মণীশকে যে চিঠিটা লিখল কাল রাত্রে সেটার যাত্রা ভালো, আপনি আপনি কেমন পরিষ্কার হয়ে গেল পথটুকু!

মালার ওপর কৃতজ্ঞতায় ভরে আসছে মনটা।···আমি তোকে ভুলব না মালা। যেমন পথ থেকে তুলে জড়িয়ে ধরেছি বুকে, তেমনি জড়িয়েই রাখব, তার পর দেখেশুনে এমন বুকেই তুলে দোব, যে আরও নিবিড়ভাবেই রাখবে জড়িয়ে।

বসে বসেই টেবিলের ড্রয়ারটা টেনে চিঠি আর সিঁদুরকৌটো রেখে দিল, তার পর উঠল ঘরটা গুছিয়ে ফেলবার জন্যে। আরও হালকা বোধ হচ্ছে মনটা।

বিছানা গুছিয়ে টেবিলটা পরিষ্কার করল। ঘরের অন্য দিকে একটা জলচৌকির ওপর ট্রাঙ্কটা রাখা, সেটা ঝাড়তে গিয়ে চৌকির নীচে একটা সবুজ কাগজের গুলির ওপর নজর পড়তে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল অরুণার। কাল সকালের কথা। অরুণা সবার চা জলখাবার শেষ করে রান্নাঘরে ঠাকুরকে এ-ঘরের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দিতে গিয়েছিল, ফিরে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতেই দেখল—মালা টেবিলে বসে লিখছিল,

ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখেই কাগজটা মুড়ে-সুড়ে জানলার দিকে ছুঁড়ে দিল। এও দেখল সে কাগজটা গরাদে লেগে ঘরের মধ্যেই এসে পড়ল আবার। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু এই সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে নরু একটা নালিশ নিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরায় মনটা একেবারে ঘুরে গেল। এর পর বিচারের পালা চলল, ওদিক থেকে সাক্ষী হিসাবে মালার ওপর টান পড়ল, একেবারে চাপা পড়ে গেল ও ব্যাপারটা।

সেই কাগজটা নিশ্চয়; মালারও আর অত খেয়াল হয় নি, কুড়িয়ে ফেলে দেয় নি। তুলে নিল অরুণা।

জোরেই মুঠোর চাপ দিয়েছিল মালা, খুব দুমড়ে-দামড়ে গেছে। টেবিলে রেখে হাত দিয়ে মসৃণ করে নিয়ে পড়ল। আগের চিঠির মতোই কাঁচা ছোটবড় অক্ষরে লেখা, শুধু আরও যেন অবিন্যস্ত। আর, আগের লেখার তবু খানিকটা বাঁধুনি আছে, এ যেন আরও ঢিলেঢালা। ঠিক চিঠিও নয়। লেখা আছে—

দিদি, মনে করলে মালাটা ভারি বোকা। আমি সব বুঝি। বেশ নিলুম তোমার দেওয়া সিঁদুরকৌটো। তোমার দান মালা পোড়ারমুখী কি কখন···

এই পর্যন্তই। এর পরই নিশ্চয় বারান্দায় উঠে এসেছিল অরুণা।

কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে নি মালা। এখানে ওখানে আরও সব লেখা। এক জায়গায় বোনা-কাজের ছোট্ট একটি ডিজাইন—একটা ফুল আর একটা আঁকাবাঁকা লাইনের। দু জায়গায় "মণীশদা"—ওপরে আর নীচে। এক জায়গায় আরও কাঁচা ইংরেজী অক্ষরে "Park", তার নীচেই আবার বাংলায় "সাবিত্রী"।

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অরুণা। না, মালা কাউকে উদ্দেশ করে লেখেনি, কোন উদ্দেশ্য নিয়েও নয়। মালা বসে বসে কাগজে আঁচড় কেটে গেছে; ছেলেমানুষ নূতন লিখিয়ের মতো কাগজ-কলম সামনে পেয়ে লেখা-লেখা খেলা করে গেছে।

তবে, মালা যদি পাকা লিখিয়ে হত, এর চেয়ে ভালো করে লিখতে

পারত না। গাঁ থেকে এখানে আসা অবধি যা যা নিয়ে ওর মনে আলোড়ন জেগেছে—শুধু তাই বা কেন, এই বছরখানেক ধরে যা যা হোল—সবগুলি আবার স্বপ্নের অসতর্ক মুহূর্তে ঐ ক'টি বিক্ষিপ্ত আর পংক্তিবদ্ধ কলমের আঁচড়ে বেরিয়ে এসেছে।···এই হোল আসল মন মালার।

চিঠিটা হাতে ক'রে অরুণা জানালার সামনে এসে অনেকক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় ফিরে এসে ড্রয়ার থেকে ওর চিঠিটা বের করে আবার গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়েই পড়ল।···এও মালাই, তবে আত্মবলি দিয়েছে মালা এখানে, সমস্ত চিঠিতে তার উপড়ে-ফেলা হৃৎপিণ্ডের রক্ত রয়েছে ছড়ানো।

মালা পেরেছে। অরুণা পারল না; শুধু, পেরেছিল বলে ক'মাস দম্ভে কেটেছে তার।

কিন্তু পারবে, পারতেই হবে।

আসল মালাকে আর একবার দেখবার জন্যেই কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরল। দুটি কথার ওপর দৃষ্টি যেন আটকে যাচ্ছে, আর সব ছেড়ে,—মণীশ আর সাবিত্রী।

তারপর, নিশ্চয় একটা যে উগ্র ভাবাবেশ এসে পড়েছে, তার জন্যেই একটা অদ্ভুত কথা মনে এসে জাঁকিয়ে বসল—এও কি সাবিত্রীর কাহিনীই নয়? নিষ্ঠুর নিয়তির মতোই অরুণা মালার কাছ থেকে কেড়েই নিয়ে এল না কি মণীশকে?

মালার পক্ষে মণীশের এটা মৃত্যুই নয় কি? প্রভেদ এইটুকু যে, নিষ্ঠুর, দুর্বার নিয়তি শেষ পর্যন্ত বুঝেছিল, শুনেছিল।

দাঁড়িয়েই রইল অরুণা বাইরের দিকে চেয়ে। এক সময় মনের কোন্ নিভৃত কন্দর থেকে দুটি ধারা বেরিয়ে, গাল বেয়ে, বুক বেয়ে এল নেমে।

এত হালকা আর কখনও অনুভব করে নি নিজের মনটাকে। ও পারবে, পেরেছিলই তো। কাল-পরশুর ব্যাপারটা?—ও কিছু নয়; কোথায় ভেসে গেছে, আর খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না।

ও পারবে, নিয়তির চেয়েও বড় হবে। ও যে মানুষ, নিজের বুক দিয়ে মানুষের দরদ বোঝে।

নিয়তি ফিরিয়ে দিয়েছিল চাওয়ার পর, ও ফিরিয়ে দেবে না চাইতেই। মানুষ বলেই শুধু ওই তো জানে না-চাওয়া কি মর্মন্তুদ চাওয়া।

একটা দুর্জয় স্রোত নেমেছে বুকে, ইচ্ছা করছে মালাকে তাতে নাইয়ে নাইয়ে আকুল করে তোলে।

একটা বই নিয়ে অচলনাথ দেরি করে ফেলেছিলেন, এ ঘরের দোরের সামনে এসে প্রশ্ন করলেন—"ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ, সত্যিই শরীরটা খারাপ নয় তো মা ?"

অরুণা যেন জ্বালাতন হয়ে আবদারের সুরে বলে—"ও জ্যাঠামশাই, শুয়ে থাকলেও শরীর খারাপ, দাঁড়িয়ে থাকলেও শরীর খারাপ, তার চেয়ে আমি বরং বাড়ি চলে গিয়ে জানিয়ে দিই বেশ আছি, দিব্যি আছি।...কাল সকালেই যাই, অমত করবেন না ; এত খারাপ হয়েছে মনটা ওরা চলে গিয়ে।"

২২

সকালে হোল না, বেরুতে দুপুর হয়ে গেল।

খুবই অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে, কথাটা হঠাৎ মনে পড়ল প্রায় নামার সময়, স্টেশনের কাছে এসে গাড়ির বেগ যখন কমে এসেছে।...

মণীশকে লেখা সেই চিঠিটা পড়ে গেছে নাকি তার হাতে!

পোস্টাফিসটা রেলের অপর পারে, বাড়ির উল্টোদিকে। নেমে হন্তদন্ত হয়ে চলল অরুণা সেই দিকে। বোধ হয় খুব দেরি হয়ে গেল! গিয়ে পোস্টমাস্টারকে প্রশ্ন করল—"চিঠি বিলি করতে সাধন বেরিয়ে গেছে জ্যাঠামশাই ?"

পোস্টমাস্টার হরনাথ অনেক দিন থেকে রয়েছেন, সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে গাঁয়ের সঙ্গে, উত্তর করলেন—"না মা, এইবার যাবে। গাড়ি থেকে এই নামলে নাকি?"

"আমাদের বাড়ির কোন চিঠি আছে?…হ্যাঁ, এই নামলুম, মনে করলুম দেখেই যাই।…মণীশ মিত্রের নামে কোন চিঠি? আর কারুর?"

"খান দুয়েক যেন ছিল।"

সাধন একাধারে পিয়ন, চাকর, রসুইয়ে। একটা ডাক দিয়ে সাড়া না পেয়ে "দেখি, দাঁড়াও"—বলে নিজেই উঠলেন। ব্যাগ থেকে চিঠির তাড়া বের করে খান তিনেক চিঠি অরুণার হাতে দিলেন। এত চঞ্চল হয়ে পড়েছে অরুণা যে হাত কেঁপে পড়ে গেল একখানা। তুলে নিয়ে দেখল মণীশেরই চিঠি, কাল রাত্রে যেটা লিখে পোস্ট করেছিল সেইটাই।

চিঠিখানা ঝোঁকের ওপর একটানা লিখে গিয়েছিল অরুণা। শেষ করেই খামে ভরে ঠিকানা লিখে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়েছিল, কি জানি, আবার যদি মত বদলে যায়। আপিসঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল। লেখা আছে—

মণীশ, ভেবেছিলাম তোমায় একটা ছুতোনাতা করে এখানে ডেকে নিয়ে এসে কথাগুলো বলব। পরে কিন্তু ভেবে দেখলাম, না। একটা ব্যবধান থাক্ আপাতত। তাই এই চিঠি। কারণটাও বলি। সেটা হচ্ছে, যা সন্দেহাতীত বলে মনে হয়েছে এতদিন—এই ধরো প্রায় তিন বছর ধরে—তা যদি আমার ভুলই হয়, সন্দেহাধীনই হয় তো তুমিও বিব্রত হবে, আমিও হব।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে, জীবনে এমন সব কথা এসে পড়ে অনেক সময় যা সামনে বলা দুষ্কর তো বটেই, চিঠিতে জানাতে গেলেও কলম যেন এগুতে চায় না। এসব অবস্থায় একমাত্র উপায় মন জেনে নেওয়া। এতেও মুশকিল এই যে, এমনও তো হতে পারে, এই তিন বছরের মধ্যে এক দিক থেকে মনের সম্বন্ধে কোন কৌতূহলই

জাগে নি। যদিও আমার দিক থেকে আমি এইটুকু বলতে পারি—আমি আমার মনটাকে কখনও অস্পষ্ট রাখবার চেষ্টা করি নি; অন্যদিকের খবর কি করে বলব?

আরও মুশকিল, আমি গুছিয়ে লিখতে পারছি না। অনেক দিন থেকেই আমার মনে একটা ঝড় বইছে, গত তিন দিন থেকে সেটা আবার একটা রীতিমত তুফানে দাঁড়িয়েছে—কতকগুলা বিরুদ্ধ হাওয়ার ঘূর্ণিই বলা ঠিক, আমায় তছনছ করে দিয়েছে। এভাবে বিদ্ধস্ত থাকার মধ্যে আমি কি করেছি না করেছি আমার হুঁশ নেই মণীশ, তোমায় সত্যিই বলছি। আমায় বিশ্বাস করো। কি বুঝলুম, কেন সে রকম বুঝলুম তাও জানি না, তবে মালাকে একটা সিঁদুর-কৌটো উপহার দিয়ে বসলুম হঠাৎ।

গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মনের যা অবস্থা, চিঠি বাড়াতে গেলে আরও শুধু বেড়েই যাবে গোলমালটা। তার চেয়ে বরং একেবারেই শেষ কথাটায় এসে পড়া যাক। মালা বলছে ও কৌটোটা আমার, তাতে ওর কোন অধিকাব নেই, আমি বলছি কৌটো ওর। মাথার ঠিক নেই, বুঝতে পারছি না, তাই নিতে হোল তোমার আশ্রয়।

শেষেরও শেষ আছে। মালা ফিরিয়েই দিয়ে গেছে কৌটোটা। জিগ্যেস করি—রাখব? ইতি

অরুণা

চিঠিটা হাতে করে শূন্যদৃষ্টিতে একটু দাঁড়িয়ে থেকে আর একবার আস্তে আস্তে পড়ে যেতে লাগল। কালকের সেটা না হয় পরের চিঠি বলে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল, এটা তো নিজের, তবু কেন অর্থ-বোধ হচ্ছে না? এক এক জায়গায় দৃষ্টি আটকে আটকে যাচ্ছে।…"আমি আমার মনটাকে কখনও অস্পষ্ট রাখবার চেষ্টা করি নি।"…কিন্তু এত নির্লজ্জভাবে স্পষ্টই বা কিভাবে করতে পারল সেইটেই ভেবে পাচ্ছে না অরুণা আজ।

বিশেষ করে শেষের লাইনটা—রাখবে কৌটাটা নিজে?…

এ-যে নির্জলা কাঙাল-বৃত্তি ; কথাগুলা বেরুল কি করে কলমের ডগা দিয়ে ?

"এখনও বাড়ি যাও নি যে মা ?"

পোস্টমাস্টার হরনাথ টেবিলের সামনে বসে কাজ করছিলেন, চেয়ার ঠেলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অরুণা চিঠিটা হাতে দুমড়ে ব্লাউসের ভেতর পুরেছে, কিন্তু তার আগেই দরজার সামনে এসে গেছেন তিনি। একটা উত্তর কোনরকমে ঠেলে বের করে দিল অরুণা—

—"না···ইয়ে, একটা দরকারী চিঠি ছিল···মনে করলুম পড়েই দেখি···"

"কারুর অসুখ নয় তো ?"

বাঁচল অরুণা। বলল—"হ্যাঁ, অসুখই, তাই ভাবলুম এইখানেই পড়ে নিই আগে···"

"ভালো খবর তো ?

"হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, ভালোই।···যাই আমি।"

তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে নেমে বাড়িমুখো হোল। লজ্জার ওপর লজ্জায় যেন মরমে মরে গেছে। বেশ বুঝতে পারছে কথা দিয়ে যতটা সামলাল, চেহারায় আর ভাবভঙ্গিতে তার চেয়ে ঢের বেশী জাহির করে ফেলেছে নিজেকে। একটা বয়স্থা মেয়ে—পোস্টাফিসের নিরিবিলিতে দাঁড়িয়ে চিঠি পড়ে—ধরা পড়বার ভয়ে লুকিয়ে ফেলে বুকের কাছে—প্রশ্ন করলে উত্তর জড়িয়ে যায় জিভে—কান হয়ে ওঠে লাল ছি ছি ছি ! কী একটা হয়ে গেল। কী হচ্ছে কাল থেকে !

হন হন করে এগিয়ে চলল। একটা উৎকট ইচ্ছা—ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার, হরনাথ চেয়ে আছেন কি না।···আছেন, নিশ্চয় আছেন। ঘুরে চাইলেই চোখোচোখি, তাহলেই ষোলকলা পূর্ণ একেবারে। দাঁতে দাঁত চেপে কোনরকমে ইচ্ছাটাকে দমন করে এগিয়ে চলল।

রাস্তাটা প্রায় সোজা স্টেশন পর্যন্ত চলে গেছে। বাঁ দিকে যোগেন পিটুরির বাগানের টানা দেয়ালটা। সেটা যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেইখানটায় বাঁ দিক থেকে একটা সরু রাস্তা এই

রাস্তাটায় এসে পড়েছে—আর প্রায় শ' তিনেক হাত দূরে। হন হন করে চলেছে অরুণা। ঐ রাস্তাটায় ঢুকে প'ড়ে দেয়ালের আড়াল হবে, তারপর রেল পেরিয়ে বোষ্টমপাড়া ঘুরে বাড়িতে গিয়ে উঠবে। হরনাথ যা মনে করেন করুন, এখন তো বাঁচবে; ছুটো চোখের দৃষ্টি পিঠটাকে যেন বিঁধছে!

আধাআধি এগিয়েছে, ঐ পথ দিয়েই দেয়ালের আড়াল থেকে কে একজন বেরিয়ে এল। "কে একজন" যে মনে হোল তা অবশ্য মুহূর্তখানেকের জন্য, কেননা লোকটা মণীশ। লাখের মধ্যে এক নজরে চিনে নেবে অরুণা, আর এ তো নির্জন গ্রাম্যপথ দিয়ে একলা চলেছে।

বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে। মণীশ সামনেই চলেছে, ওদিকেই মুখ করে। চলেছে অতি মন্থর গতিতে, শরীরে একটু যেন দোল দিয়ে দিয়ে। বাঁ হাতে এক গোছা রাঙা শাপলা ফুল।···কি করবে? ডাকবে? কিন্তু এই পরিস্থিতিতে? তার চেয়ে তাড়াতাড়ি ঐ সরু পথটায় ঢুকে পড়ে ও-ও মুখটা ঘুরিয়ে নিক উল্টো দিকে।···হে ভগবান, আর মিনিটখানেক মণীশ যেন মুখটা না ঘোরায় এদিক পানে।···মিনিটখানেকও লাগবে না আর।

একটা মানুষ একই সঙ্গে এত দূরের আবার এত কাছের, এত নিজের আবার এত পর কি করে হয়? ইচ্ছা করছে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরি একটা হাত।···রাঙা শাপলা হঠাৎ এত প্রিয় হয়ে উঠল যে মণীশের! পার্কের সেই রাত্রি থেকে নাকি?··শাপলা-ফোটা পুকুরের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে গেছল না মালা?···

ভুল হয়ে গেছে। মণীশের পদক্ষেপ যেমনি অলস আর মন্থর, অরুণা নিজের গুলা তেমনি দ্রুত আর অসংযত করে ফেলেছে। শব্দ উঠে পড়েছিল, ও-রাস্তাটায় প্রায় ঢুকে পড়বে, মণীশ ঘুরে চাইল। নিশ্চল হয়ে গেছে। বিশ্বাস করতে পারছে না।

"রুণাদি!!"

"মণীশ নাকি?···মণীশই তো দেখছি। হ্যাঁ, এই গাড়িতে

নামলুম।…গিয়েছিলুম…মানে, পোস্টাপিসটা ঘুরে এলুম একটু। ভাবলুম পিটুরিদের বাড়িটাও একবার ঘুরেই যাই।"

আর যেন কোন প্রশ্ন না করতে হয় মণীশকে। আগেভাগেই সব জানিয়ে দিচ্ছে।

একরাশ প্রশ্ন ঠাসা মণীশের দৃষ্টিতে। কোন্‌টা আগে করে?

"তা হঠাৎ এ-গাড়িতে যে! শরীর ভালো তো?"

হঠাৎই অশ্রু ঠেলে উঠেছে, যেন কোটালের বান। জিভ কামড়ে ধরেছে অরুণা, যেন এইবার রক্ত বেরিয়ে আসবে। সামলে নিয়েছে কোনরকমে, অন্তত নিজে তাই মনে করল; তবে মুখটা একবার নিতেই হোল ঘুরিয়ে। আসার কথাটা তুলতে গেলে কিন্তু আর পারবেই না সামলাতে, বলাও তো যায় না এক কথায়! শরীরের কথাটা ধরেই বলল,"না, শরীরের কি হবে। ভালোই তো আছি।"

একটা অতি সাধারণ প্রশ্ন—ও শাপলা হাতে করে আসছে কোথা থেকে—এটাও মুখ দিয়ে বের করতে পারা যাচ্ছে না। মণীশ আর বাড়ালও না কথা, চেনেই তো। একটা কিছু আন্দাজ করবার চেষ্টাও তো চলছে ভেতরে ভেতরে। বলল—"পিটুরিদের বাড়ি কোন কাজ আছে নাকি? না হয় চলো না বাড়িতে, পরে এলেই হবে।"

সাধারণ কথা, কিন্তু এত মমতা-ঢালা, আর শুধু কণ্ঠস্বরেই এত সব পুরনো কথা টেনে আনছে যে এইবার বুঝি বেরিয়েই পড়ে অশ্রু বাঁধ ভেঙে। যেন কথা বাড়াবার আশঙ্কাতেই রাজী হয়ে গেল অরুণা, যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে বলল—"তাই চলো।"

এগিয়ে চলল দুজনে। কিন্তু আর পারছে না। মনে মনে যেন কাঁটা হয়ে রয়েছে, এখনি কোন্ প্রশ্ন উঠবে, এখনি কোন্ কথা, এমনি দরদে ভরা; করবে কি তখন?

একটু বুদ্ধি জুগিয়ে গেল মাথায়। বলল—"তুমি না হয় এগিয়েই যাও।…হ্যাঁ, এগিয়েই যাও।"

"কেন?"—বেশ বিস্মিতভাবে ঘুরে চাইল মণীশ।

"কেন!...কেউ আমাদের দুজনকে একসঙ্গে এভাবে যেতে দেখলে..."

"আমাদের দুজনকে! গাঁয়ের মধ্যে নতুন নাকি?"

একটা ধক্‌ করে আঘাত লাগল বুকে। আর পারছে না, পারছে না আর।

"ওরা দুজন!"—কত কী যে রয়েছে যুগ্ম কথা দুটির মধ্যে।

আর একটু বুদ্ধি জোগাল। এবার ভালোই হোক বা সত্যই হোক, একটু বিরক্তই হয়ে উঠল অরুণা, বলল—"তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি বড় কম মণীশ। মনে কর খুব বোঝ। যাও এগোও, নৈলে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। না হয় যেমন পিটুরিদের বাড়ি যাচ্ছিলুম ..."

"বেশ আমিই যাচ্ছি এগিয়ে, তুমি কিন্তু এসো শীগগির।"

উলটে গেল, ওর গতি এবার দ্রুত, এর মন্থর। একটু দূরে গিয়ে পড়তে হুঁশ হোল, অরুণা গলা তুলে বলল—"আমি এসেছি কিন্তু বলবে না আগেভাগে।"

"না, কিন্তু এসো শীগগির।"

একটা হাওড়া-গামী গাড়ি আসছে। স্টেশনের কাছেই এসে পড়েছে ওরা। মণীশ পা চালিয়ে বেরিয়েই গেল। অরুণা যে না পারত এমন নয়, কিন্তু হঠাৎ আর একটা খেয়াল মাথায় উদয় হওয়ায় পদক্ষেপ আরও শিথিল করে দিল। কলকাতায় ফিরে গেলে কেমন হয়?

গাড়িটা যে মিনিট দুয়েক রইল, একটা অমানুষিক চেষ্টায় স্পন্দনহীন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অরুণা; টিকিটঘরের দিকে চাইতে সাহস হচ্ছে না, এখনি বুঝি ভুলটা করে বসে! কিনে ফেলে টিকিট।

গাড়িটা চলে গেলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল।

আর একটা পরীক্ষা—বাড়িতে গিয়ে ওঠা। কিন্তু সমস্ত শক্তি যেন নেমে যাচ্ছে, রেল পেরিয়ে কোন রকমে পা দুটোকে টেনে টেনে

এগুতে লাগল। মণীশ অনেকখানি এগিয়ে গেছে।…কী ভাবতে ভাবতে যাচ্ছে ও? কীই বা মনে করল?

আর যেন উঠতে চাইছে না পা।

পুকুরের ধার দিয়ে যে রাস্তাটা সোজা গেছে বাড়িতে সেটা ছেড়ে দিল। ডোবার ধার দিয়ে ঘোরা রাস্তাটা ধরল, যতটা পারে অলক্ষিতে থেকে বাড়িতে গিয়ে উঠতে চায়। মণীশ গিয়ে ঢুকল, ও তখন একটু আড়ালে পড়ে গেছে। কানে যাচ্ছে মণীশের শাপলা ফুলের জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে কলরব পড়ে গেছে। ভালোই হোল, মেতে থাক ওদিকে সবাই।

মিনিটখানেকের মধ্যে ও-ও পড়ল এসে। বাঁদিক ঘুরে দরজার সামনে হতেই কলরবটা আরও উত্তাল হয়ে উঠল—"দিদি এসেছে! দিদি!…পিসীমা এসেছে!…পিছি… !"

নরুই এসেছে এগিয়ে। অরুণা চৌকাঠ ডিঙিয়ে তাকে তুলে নিয়ে স্নেহের সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় জাপটে ধরল বুকে। সঙ্গে সঙ্গে চোখে বান ডাকল।

থামতে চায় না আর কান্না। একদিনের চোখের জল নয় তো, নরুকে নিয়েও নয়। নরু তো উপলক্ষ মাত্র।

কিন্তু সেকথা কি কেউ বুঝল?

বড়বৌ পিঠে হাত দিয়ে বারান্দায় নিয়ে গেল। সবাই এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, ললিতমোহনও এসেছেন নেমে। সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। জ্যাঠাইমা বলছেন—"আমি তখনই বলেছিলুম সবগুনোকে দিও না পাঠিয়ে। একদিন হৈ-হৈ করে চলে আসবে, তারপর সে আর টেঁকতে পারবে না সেখানে—"

আসল কথাটা কে বুঝবে? মালা বুঝল কি? বড় গুমোর করে যে লিখেছিল—সব বোঝে সে। মুখে আঁচল চেপে সেও কাঁদছে; কিন্তু সে তো একটা অবুঝ সহানুভূতির কান্না মাত্র।

সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে এক শুধু মণীশ ছাড়া। সে কাউকে কিছু

না বলে ললিতমোহনের ঘরের পাশে নিজের ঘরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। বুঝেছে কি না বুঝেছে সে-ই জানে, তবে তার চোখেও অবিরাম ধারা।

মাঝে মাঝে শঙ্কিত ভাবে ঘুরে চাইছে। যদি কেউ এসে পড়ে, যদি প্রশ্ন জাগে—দুজনের চোখে একই সময়ে এই ধারাবর্ষণ কিসের?

২৩

কিন্তু হোল ভাল, তার কারণ এই অশ্রুরই ছিল প্রয়োজন।

অশ্রুর স্রোতে সব গ্লানি ভাসিয়ে দিয়ে মনটাকে খুব হালকা আর সহজ করে দিয়েছে। আরও সুবিধা করে দিল এই ধারণাটা যে ছেলেমেয়েদের টানেই ছুটে এসেছে অরুণা। এই ধারণার আড়ালে ও, বেশ স্বচ্ছন্দে নিজের মনটাকে লুকিয়ে রাখতে পারল সমস্ত দিন। ওদের নিয়েই কাটাল—ঘুরে বেড়িয়ে, গল্প করে। মালা সেই গোড়ায় একবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তার পর ক্রমাগতই ওকে এড়িয়ে গেছে। যাবেই তো; চিঠির কথা, কৌটোর কথা রয়েছে, এটুকু তো সে জানেই যে তার সঙ্গে অরুণার হঠাৎ চলে আসার একটা সম্বন্ধ আছেই। অরুণা কিন্তু তাকে টানবার কোন চেষ্টাই করল না। তার মানে, যতটা সম্ভব, যতক্ষণ সম্ভব মুক্ত করেই রাখল নিজেকে। মালাকে টানলেই তো আবার সেই জটিলতা।······থাক্, হবেই দেখা, তখন যা হয় হবে।

মণীশকেও বাদ দিল। আপাতত জীবনের ও পাতাটাই যেন মুড়ে রেখে এদের নিয়ে মেতে রইল।

দিনটা এইভাবে কাটল।

কিন্তু আগাগোড়া তো এভাবে কাটতে পারে না। বেশী ঘোরাফেরা দাপাদাপি করবার জন্তেই ছেলেমেয়েগুলো সন্ধ্যা হওয়ার

আগেই ঝিমিয়ে পড়ল। তখন মনটা খালি পেয়ে নিজের চিন্তাগুলোই সন্ধ্যার ছায়ার মতো জমাট বেঁধে আসতে লাগল। ও কী করতে এসেছে সেটা বেশ স্পষ্ট বলেই যেন আরও শক্ত। তার কারণ আছে। ঘটনাগুলো একখানা উপন্যাসের মতোই দ্রুত গতিতে ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগুচ্ছে। এর আগের অধ্যায়ে ছিল সিঁদুর-কৌটোটা দেওয়া।

কিন্তু সিঁদুর-কৌটো যতই হোক একটা প্রতীক মাত্রই তো। তাই, তার পরেও ফিরে আসার, মণীশকে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবতে পারা গিয়েছিল। এবার তো এমনই কিছু একটা করতে হবে যাতে ফিরে আসার, ফিরিয়ে নেওয়ার প্রশ্নই আর উঠবে না।

ওর প্ল্যানটা এখনও ঠিক হয় নি, তবে সেটা যে শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণই হবে এটা তো ঠিক। আর দেরি করাও চলে না। এখন সেই শূন্যের কিনারায় এসে পা দুটো যেন শেষ বারের মতো কেঁপে উঠছে, বুকটা দুর দুর করছে।

কি করবে এবার? মণীশকে ও এড়িয়ে চলছে, মালা এড়িয়ে চলছে ওকে, একলা একলা করে কি এখন? ভাজেদের সঙ্গে একটু গল্প করল। তার পর ওপরে উঠে যাচ্ছিল নিজের ঘরে, ছাথে ললিতমোহন বাইরে যাওয়ার সাজে নেমে আসছেন। দাঁড়িয়ে পড়ে প্রশ্ন করল—"কোথায় যাচ্ছেন দাদু?"

উত্তর হোল—"একবার খামারটা ঘুরে আসি দিদি। শরীরটা কদিন খারাপ ছিল, যেতে পারি নি, ধানগুলো এবার কেটে আনবে, মাড়াবে, ঝাড়বে—কি করছে না-করছে জানি নে।"

"আমিও যাব? নেবেন সঙ্গে?"

"অনেকটা দূর যে, ফিরতে হয়তো রাতই হয়ে যাবে আমার।"

"তা হোক, অনেকদিন যাই নি মাঠের দিকে, ভুলেও গেছি কেমন হয়…"

"কলকাতার পার্কে ঘোরার পর আর কি তোমার…"

ধক্ করে একটা ধাক্কা লাগল বুকে…কলকাতার পার্ক!…

অরুণা একটু আবদারের জিদ করেই বাধা দিয়ে বলল—"না দাদু, যাবই আমি ; আপনি দাঁড়ান, এলুম বলে।"

পাশ কাটিয়ে বেশ দ্রুত পদেই তরতর করে উঠে গেল। জামাকাপড় একটু গুছিয়ে নিতে নিতে একবার সাড়া নেওয়ার জন্য ওপর থেকে হাঁক দিয়ে বলল—"দাঁড়াবেন দাদু, যাচ্ছেন না তো চলে ?"

সাবিত্রী দেবী ওপরে উঠে আসছিলেন, প্রশ্ন করলেন—"ও-ও যাবে নাকি কাকা ?"

"আবদার ধরেছে তো। এদিকে বোধহয় রাত হয়ে যাবে।"

"ওর মন আবার সেই গাঁয়ে ফিরে আসছে, এই বলে দিলুম আপনাকে, আর বেশী দিন নয়!"—গলাটা নামিয়ে অল্প একটু হাসির সঙ্গেই সাবিত্রী দেবী কথাটা বললেন শ্বশুরকে।

ললিতমোহন বললেন—"তুমি যা ভেবে বলছ বোধ হয় বুঝেছি মা ; কিন্তু তা যদি হয় তা হলে ওর ঘর তো শহরেই।"

"মণীশের কথা ধরে বলছেন কাকা ? তার মন অনেক দিনই শহর থেকে উঠে এসেছে। আপনি এবার তুলুন কথা, কদিন থেকে আপনাকে বলব মনে করছি। নাতনীকে আপনার ঘরের বাইরেও পাঠাতে হবে না।···বাড়ির সঙ্গে তেমন সম্বন্ধ তো নেইও মণীশের। এর পরে তখন ওদের একটা আলাদা···"

"দাদু চলে গেলেন নাকি ?"

কোন সাড়া না পেয়ে প্রশ্নটা মুখে করেই হনহন করে চলে আসছে অরুণা। সাবিত্রী দেবীই আবার গলা খুলে উত্তরটা দিলেন —"না রে, এই রয়েছেন তোর জন্যে।"

অরুণাদের বাড়িটা গ্রামের একটু বাইরের দিকেই। তবুও যেটুকু ঝোপঝাড় আছে, খানিকটা যেতে সেটুকুও পরিষ্কার হয়ে গিয়ে একেবারে ফাঁকা মাঠ এসে পড়ল। এর পর কানা নদীর ধার দিয়ে খানিকটা গিয়ে খামারটা, বাড়ি থেকে পোয়াখানেক পথ।

পথেই খানতিনেক মেটে ঘর নিয়ে এদের ভাগ-চাষী বিনোদ

বাঘের বাড়িটা। সবটুকু খালের ধারেই। বাড়ির সঙ্গে একটা আম আর একটা নোনা গাছ। তা ছাড়া সমস্ত জায়গাটাই একেবারে ফাঁকা।

কাজ হচ্ছে। খামারের উঠানে রাশি রাশি ধান এসে পড়েছে, আসছেও, পাটে আছড়ে ঝাড়া হচ্ছে, জড়ো করা হচ্ছে, লোক খাটছে অনেকগুলি। বিনোদ বাঘ এসে দাঁড়িয়ে ছিল, ললিতমোহন তার সঙ্গে হিসেবে লেগে গেছেন কোন্ মাঠ থেকে কত ধান এল, কত গোলায় উঠেছে; অরুণা বলল—"আমি ততক্ষণ একটু ঘুরে আসি দাছ।"

নদীর ধার দিয়েই খানিকটা গিয়ে একটা খেজুর গাছ। গোড়ার দিকটা হাত দেড়েক মাটির ওপর শোওয়ানো, তার পরেই গাছটা ধনুকের মতো বেঁকে ওপর দিকে উঠে গেছে, নীচেই নদী। অরুণা গোড়াটার ওপর গিয়ে বসল।

অনেকদিন এদিকে আসে নি বলে মনে হচ্ছে একেবারে যেন একটা নূতন জগতে এসে পড়েছে। অন্তত এটা ঠিক যে আজকের দৃষ্টি নিয়ে আর কখনও দেখে নি জায়গাটাকে। পূবে, ওর ডান দিকে গাছপালা-ঝোপঝাড়ে ঢাকা গ্রামটা, তার পর থেকেই উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি যায় খোলা মাঠ। বেশী ভাগই শূন্য, ধান কাটা হয়ে গেছে, কচিৎ কোথাও সোনার রঙের পাকা ধান আছে দাঁড়িয়ে।...দূরে পশ্চিমে গাছপালার আড়ালে নেমে গেছে সূর্য, হেমন্তের অল্প কুয়াশা-ছোঁওয়া নির্মেঘ আকাশে তার শেষ আভা আবীরের মতো পড়েছে ছড়িয়ে। নদীর জলে তার প্রতিচ্ছবি ঝলমল করছে।

মনটা একটি বিষণ্ন আনন্দে আস্তে আস্তে ভরে আসছে। রিক্ততার সঙ্গে একটা অপূর্ব পূর্ণতার অনুভূতি। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে বাইরেও তো এই দৃশ্যই দেখছে অরুণা।...মাথায় করে বোঝা বোঝা ধান কেটে নিয়ে আসছে, ধরিত্রী নিজেকে শূন্য করে করছেন পূর্ণ। সমস্ত দিন অকুণ্ঠভাবে সৃষ্টির মাঝে নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে

সূর্যও রিক্তসম্পদ হয়ে সার্থক হলেন, এই তো তাঁরও পূর্ণতা।···কী হবে ক্রমাগতই নিজের চারিদিকে সব কিছু জমা করে করে নিজেকে স্ফীত করে তুলে? কোথায় দৈন্য আছে, বেদনা আছে, সেইখানেই নিজেকে দাও বিলিয়ে; পূর্ণ কর, নিরাময় কর।

চোখ দুটি আপনা থেকেই ছলছল করে আসছে। এ অশ্রু যে কেন কিছু বোঝা যাচ্ছে না, শুধু এইটুকু মনে হচ্ছে অরুণার যে এই ঠিক সময় এসে পড়েছে। এই রকমের কাটা ফসলের গন্ধ থাকবে চারিদিকে ছড়িয়ে, পৃথিবীর কাছে উজাড় করে দিয়ে সূর্য নেবে বিদায়, এই তো মহালগ্ন জীবনের পরম সমর্পণের। সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ওপরে উঠে মনটা তারই জন্যে হয়ে উঠেছে চঞ্চল। উঠে এখনই গিয়ে কিছু একটা না করলে যেন চলছে না।

তবু বসেই রইল। এবার এমন একটা কিছু করতে হবে যা হবে একেবারে নিঃসংশয়। তারই একটা রেখারূপ তৈরী করে নেওয়ার জন্যে রইল বসে। কোনটাই কিন্তু মনঃপূত হচ্ছে না।

ললিতমোহন যখন ডাক দিলেন, তখন বেশ সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তবে আকাশে শুক্লা একাদশীর চাঁদ, অন্ধকারের দেখা নেই বিশেষ।

চলতে চলতে কী করবে তার আর একটা খেই ধরল অরুণা। মণীশ আর মালা দুজনকেই ঘাটে ডেকে নেবে, তারপর···

মণীশ নিশ্চয় এতক্ষণ মালাকে পড়াতে বসেছে। বাড়ি এসে অরুণা সোজা উঠে যাচ্ছিল, সিঁড়ির মোড় ঘুরে দেখে মণীশ আস্তে আস্তে নেমে আসছে, মাথাটা একটু হেঁট করেই। ওকে দেখেই চকিত হয়ে তুলল মাথাটা।

"চললে যে? মালাকে পড়াবে না?" অরুণা প্রশ্ন করল।

উত্তর হোল—"তার শরীরটা খারাপ।"

ওপর দিকে চোখ তুলে একটু ভেবে নিল অরুণা। শরীর খারাপ—তার মানে, অরুণাকে সমস্ত দিন এড়িয়ে যাওয়া গেল, রাত্রে তো আর যাবে না। তাই একটা ছুতো।

পরক্ষণেই খুব চিন্তিত হয়ে উঠল, বলল—"শরীর খারাপ? কেন? চল তো দেখি।"

বারান্দার একেবারে ও-প্রান্তে পড়ার জায়গা মালার, পাশেই তার থাকবার ঘর। আসলে ওটা অরুণারই ঘর, এখন মালার দখলে। এলে অবশ্য সেও এই ঘরেই থাকে।

ও-ই এগিয়ে গেল! মণীশের গতি মন্থর হওয়ায় ঘুরে একবার তাগাদা দিল।

মালা ছিল ঘরের মধ্যে ওদিককার জানলার সামনে দাঁড়িয়ে, বাইরের দিকে মুখ করে। খুব অন্যমনস্ক ছিল নিশ্চয়, টের পায় নি পায়ের শব্দ, অরুণা একেবারে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতে ঘুরে দেখে যেন কাঠের পুতুলের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল।

অরুণা প্রশ্ন করল—"শরীর খারাপ তোর?"

আতঙ্কে মুখটা এতটুকু হয়ে গেছে মালার; জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিয়ে বলল—"না তো।"

আসতে আসতেই মনে একটা প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছে অরুণা; সেই নিঃসংশয় চরম সমর্পণ। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে। তাইতে প্রশ্নটাও একটু যেন রুক্ষ ভাবে বের হয়ে পড়েছে। এগিয়ে গিয়ে ওর হাতটা ধরল, নরম করে বলল—"হয়েছে নিশ্চয়, লুকুচ্ছিস তুই। নতুন হিম, আয়, জানলার ধার থেকে সরে আয়, লক্ষ্মী বোনটি।"

বিছানার সামনে টেনে নিয়ে এসে বলল—"শুয়ে পড়।"

বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছে মালা। শুলো না, মাথাটা হেঁট করে বসল বিছানার ধারে।

অরুণা টেবিলের কাছে গিয়ে দেরাজে একটা টান দিয়ে মণীশের দিকে ঘুরে চেয়ে বলল—"তুমি তো নাড়ী দেখতে জান মণীশ?... হ্যাঁ, জানই তো, কলকাতায় দেখতে আমার অসুখে।"

মণীশ সমস্ত ব্যাপারটাকে হালকা করে দিয়ে একটু হেসেই বলল—"একেবারে নাড়ী টেপার মতো কী হয়েছে এমন?"

দেরাজটা ঠেলে দিয়ে এগিয়ে এল অরুণা, একটু একটু যেন কাঁপছে। কতকটা জিদের সঙ্গেই বলল—"ছাখোই না তুমি একবারটি ; সব-তাতেই তোমার আজকাল যেন…"

"বেশ, তা নয় দেখছি।" হেসেই কথাটা বলে মালার ডান হাতটা তুলে নিল মণীশ।

ওরও বড় অদ্ভুত লাগছে, অরুণার কাঁপুনিটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেই রকম ভাবেই বলল—"কৈ কিছু?…কিন্তু রুণাদি, শরীর খারাপ ওর, কাঁপুনি হবে তোমার।"

হাতটা ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল, অরুণা একটু যেন ঝাঁপিয়ে পড়েই দুজনের হাত একসঙ্গে চেপে ধরল। বলল—"না, ছাড়তে পারবে না মণীশ। আগে প্রতিজ্ঞা কর, নিলে।"…

আরও কাঁপছে। এত অতর্কিত, এত অদ্ভুত, একেবারে কিম্ভুতকিমাকার হয়ে গেছে মণীশ। স্খলিত কণ্ঠে বলল—"কী বলছ তুমি রুণাদি!"

"ঠিকই বলছি…একদিন বলেছিলে মনে করে ছাখো।"

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে মুখের দিকে মণীশ, যেন একটা ছুতো হিসাবেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—যেন পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই—"এক জনের কথাতেই হয়?"

ড্রয়ার থেকে তখন সিঁদুরের সেই কৌটোটাই বের করে নিয়েছিল অরুণা, এনেছিল কলকাতা থেকে। বাঁ মুঠোটা খুলে মালার ডান হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—"নে, ধর। খবরদার, ফেলবি নি মালা এবার!……কলম ধরলেই মণীশের নাম যেখানে সেখানে ছিটকে বেরুচ্ছে, এদিকে যত সব আদিখ্যেতা!"

মণীশের দিকে চেয়ে বলল—"সবার কথা কি বেরোয় মুখ ফুটে?"

এটা কিন্তু নিতান্তই যেন হঠাৎ হয়ে গেল, ওদের দুজনের কেউই যখন প্রস্তুত ছিল না। তাই অরুণা দুজনের কাছেই একবার করে ভজিয়ে নিল।

মালা শুধু অশ্রুপাতই করে গেল। তার বেশী আর কিছু দরকারও ছিল না, কেননা মেয়েদের অশ্রু মেয়েরা বোঝে, জানে তা যত নীরব, ততই মুখর।

মণীশের একটা চক্ষুলজ্জা ছিল অরুণার কাছে, তাই সে ভাষারই সাহায্য নিল। বলল—যেটাকে কথা দেওয়া বলছে অরুণা সেটা কি মণীশ এই অর্থেই দিয়েছিল? এখন তাই ভেবে যদি মালাকে এগিয়ে দিয়ে মালার এই অবস্থা করে নিয়ে এসে থাকে তো আর কি-ই বা উপায় আছে?

কথা দিল, যাতে অরুণার অর্থেই মালাকে না ভোলে তার চেষ্টা করবে।

হঠাৎ হলেও দুজনের কেউই যে অ-প্রস্তুত ছিল না সেটা তো জানতই অরুণা। ভজিয়ে স্পষ্ট করে নিয়ে নিশ্চিন্ত হোল।

২৪

অরুণাদের বাড়ি কেন্দ্র করে মণীশের ওদিককার যে জীবন তাতে এই ছিল শেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর পর সহসা সে এ-কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এগারো বৎসর কেটে যায়। একটা যুগ।

বিচ্যুত হোল যে ব্যাপারটুকু উপলক্ষ্য করে তা কিন্তু অতি সামান্য; তাতে মাত্র সাময়িক ভাবে কিছুদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবার কথা। কিন্তু যাওয়ার মুখে একটা যেন পিছু-ডাকে যাত্রা নষ্ট হয়ে গেল, প্রভেদটা হয়ে গেল বিপুল।

একদিন সন্ধ্যার পর মণীশ বেড়িয়ে এসেছে নিজের ঘরে, জুতো জামা ছাড়ছে, মালা এসে একটা খাম হাতে দিল, বলল—"এইটে এসেছে।"

টেলিগ্রাম একটা। মণীশ প্রশ্ন করল—"কখন এল?"

"এই একটু আগে। কেউ ছিল না, বড়বৌদি দস্তখৎ দিয়ে নিলেন। ঘাটে গা ধুতে গেছেন, বললেন, এলেই দিয়ে দিবি।"

মণীশের বৈমাত্র দাদার টেলিগ্রাম। শীঘ্র চলে আসতে বলেছেন। কেন, কি বৃত্তান্ত সে-সব কিছু জানান নি। তবে এটুকু বলা আছে যে খবর সব ভালোই, চিন্তার কোন কারণ নেই।

ভাঁজ করে একটু চিন্তিত ভাবেই খামে রেখে দিচ্ছিল, মালা উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, প্রশ্ন করল—"কার টেলিগ্রাম? খবর…"

"ভালোই।"

কথাটা শুনে মালার দৃষ্টির উদ্বেগটা কমে আসছে, মণীশ আবার জুড়ে দিল—"খবর ভালো, কিন্তু আমায় এই গাড়িতেই যেতে হবে একবার।"

টেবিলে রাখা হাতঘড়িটা তুলে নিয়ে বলল—"আর মাত্র মিনিট পঁচিশেক আছে। তুমি তাড়াতাড়ি একটু চা·· থাক্ না হয়, গাড়িটা ধরতেই হবে। তুমি ঐ স্যুটকেসটা এগিয়ে দাও তো।"

গাড়ির কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গিয়ে বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

মালা স্যুটকেসটা আনতে আনতে বলল—"চা এখুনি হয়ে যাবে। দেখি আমি।"

মানাই করল মণীশ, মালা কিন্তু ততক্ষণে খানিকটা নেমে গেছে।

ও যাওয়ার মিনিটখানেক পরেই মেজ-বৌ একটু হন্তদন্ত হয়ে প্রশ্নটা একরকম মুখে করেই উঠে এল—"টেলিগ্রামে কী এসেছে মণীশ ঠাকুরপো?"

মণীশ স্যুটকেসে জামাকাপড় ভরছিল, মুখটা ঘুরিয়ে একটু হেসে বলল—"একটা জিন-আঁটা ঘোড়া, এক্ষুনি বেরুতে হবে।···তোমায় বুঝি মালা পাঠিয়ে দিলে?"

"সত্যি, খবর ভালো তো?"

মণীশ খাম থেকে টেলিগ্রামটা বের করে হাতে দিয়ে আবার

টুকিটাকিগুলো স্যুটকেসে রাখতে লাগল। মেজ-বৌ পড়ে নিয়ে টেবিলে রেখে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত ভাবেই মন্তব্য করল—"ছুটো কথা বেশী দিয়ে কাজটা কী জানিয়ে দিলেই পারতেন; ভাবনা হয় তো।"

ব্যস্তভাবে গোছগাছ করতে করতে মণীশ সেই ভাবে একটু হেসেই বলল—"এখানে যে মালা আছে, বৌদিরা আছেন, অতটা খেয়াল হয় নি তাঁদের।...জ্যাঠাইমা কোথায় মেজবৌদি? জপে বসে গেছেন?"

"যোগাড় করছিলেন তো..."

একটা জামা ঠিক বসছিল না স্যুটকেসে, ছেড়ে দিয়ে আবার একটু ত্রস্ত হয়েই বলল মণীশ—"ঠিক করে দিন তো, আমি প্রণামটা করে আসি..."

ঘর থেকে বেরও হয় নি; নীচে থকে প্রশ্ন হোল..."হ্যাঁ রে, মণীশ চলে গেল নাকি? কি টেলিগেরাপ এসেছে?"

"দেখুন কাণ্ড!"—বলে একবার মেজ-বৌয়ের দিকে চেয়ে নিয়ে মণীশ গলা চড়িয়ে বলল—"যাই নি এখনও জ্যাঠাইমা, আসছি দাঁড়ান। খবর খারাপ কিছু নয় তো।"

সিঁড়িতে পা দেবে, ছাখে উনিই উঠে আসছেন, জপের জন্মে গরদের থানটা পরা।

বলতে বলতে উঠে আসছেন—"তবে যে মালা বললে—খারাপ খবর, এখুনি যেতে হবে—হয়তো আর আসবেন না..."

উনান এ-সময়টা ধরানোই থাকে, মালা চা হাতে করে সিঁড়ি বেয়ে আসছিল ওঁর পেছনে পেছনে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল মণীশের মুখের দিকে। মণীশ হেসে বলল—"তা, নিয়ে এস শীগগির, যদি না-ই আসি তো তৈরী চা পড়ে রইল বলে তোমারই তো আপসোস থেকে যাবে মালা।"

গুরুতর কিছুই নয়। মণীশের সংমা কিছুদিন থেকে হৃদ্‌রোগে

ভুগছিলেন, কাশীতে একটা বাড়ি নেওয়া হয়েছে, চেঞ্জেও যাবেন। মণীশ নিয়ে যাবে, থাকবেও এখন সেখানে।

খুব সাধারণ ব্যাপার। যাওয়ার ব্যবস্থা সব ঠিকই ছিল, মণীশ যেমন তাড়াতাড়ি এসেছে, সত্ত সত্ত যদি ওঁকে নিয়ে চলে যায় তো জীবনের নিতান্ত সাধারণ পথ ধরেই ঘটনাগুলো এগিয়ে যায়; কিন্তু তা হোল না।

হোল না বিদায়কালের সেই ছুটি চোখের দৃষ্টির জন্যে।...চা হাতে করে আস্তে আস্তে উঠে এসেছিল মালা। সবাই জড়ো হয়েছে বাড়ির, ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত। ললিতমোহনও ফিরেছেন খামার থেকে। টেবিলে বসেই চা পান করতে করতে সবার সঙ্গে কথা বলছে মণীশ, সবাই কিছু না কিছু উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করছে, উত্তর দিচ্ছে মণীশ, শুধু একজনের মুখে কোন প্রশ্ন নেই।...মালা আছে একটু তফাৎ হয়েই পেছনে দাঁড়িয়ে। মুখটা একেবারে যেন ভাবলেশহীন। যখনই মুখের ওপর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল, সেই রকম ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে।

রাত করেই বাড়িতে পৌঁছল মণীশ, তার পর যতক্ষণ জেগে রইল, বেদনায় মনটা টনটন করতে লাগল। এই একজন যার সবচেয়ে বেশী প্রশ্ন করবার ছিল, সবচেয়ে বেশী ছিল বলবার, কিন্তু একটা কথাও মুখ দিয়ে বের করতে পারল না। রাত্রে ভালো করে ঘুমোতে পারল না মণীশ, ছাঁৎ ছাঁৎ করে ভেঙে যায় ঘুমটা, তার পর রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে ঐ কথাটুকুই যেন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে থাকে, ছুটি চোখ তাদের নীরব প্রশ্ন নিয়ে থাকে মুখের পানে চেয়ে।

ওঠার পর থেকেও যাত্রার আয়োজনের মধ্যে ক্রমাগতই ছোটছোট ভুল হয়ে যেতে লাগল। তার পর এক সময় একটা কথা মনে পড়ে যেতে একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইল মণীশ।

মালার যা আতঙ্ক তা তো করেছে প্রকাশ, শুধু নিজে মুখ ফুটে বলতে পারে নি।...

জ্যাঠাইমা উঠে আসতে আসতে বললেন—মালা বলছে, খারাপ খবর, আর নাকি আসবে না মণীশ।

নিজের মুখে বলার চেয়ে আরও কত মর্মন্তুদ। প্রশ্ন করার কী লজ্জাকর কৌশল!···মনে পড়ছে, মালা এসে সবার পিছনে দাঁড়িয়ে রইল যেন কত বড় অপরাধী একটা।

নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে থাকার মধ্যেই আর একটা কথা যেন বিদ্যুৎ-ঝলকে মনে পড়ে গিয়ে মনটাকে একেবারে অবশ করে দিল। অরুণার সঙ্গে দেখা করা হয় নি যে! এ ভুল কি করে সম্ভব হয়?

কাশীর গাড়িটা দুপুর বেলায়। মণীশ যখন যাত্রাটা একদিনের জন্য স্থগিত রাখবার কথা বলল মাকে আর দাদাকে, তখন বেরুবার আর ঘণ্টা দুয়েকও নেই।

অরুণার কথাটা তুলেই বলল, অবশ্য তার নাম করে নয়। বলল—তাড়াহুড়োর মধ্যে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল—কয়েক জনের সঙ্গে দেখা করে কয়েকটা ব্যাপার ঠিক না করে গেলেই নয়। কয়েক জনের মধ্যে অবশ্য মালাও রইল। আবার নতুন করে পাঁজি দেখতে হোল। মাঝে একটা দিন বাদ পড়ল।

২৫

অথচ অরুণার সঙ্গে দেখা করতে একেবারে ইচ্ছা হচ্ছে না। ইচ্ছাও নয়, সাহস হচ্ছে না বলাই ঠিক। সময়ও বাছল মণীশ ঠিক সেই রকম।

ওর কলেজের দৈনিক রুটিনটা মোটামুটি জানা আছে। গিয়ে যখন উপস্থিত হোল, অরুণা প্রায় গোছগাছ করে বেরুচ্ছে কলেজের জন্যে। অচলনাথ চলেই গেছেন।

বেশ বিস্মিতই হোল অরুণা ওকে দেখে। কথাবার্তা স্বভাবতই খুব সংক্ষিপ্ত হোল। ফুরিয়েও তো এসেছে, সংক্ষিপ্ত হোল বলে বোধ

হয় অরুণাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বারবার এই কথাই বলল—চিঠি যেন ঠিকমত আসে। হোস্টেলের গেটের কাছে ছাড়াছাড়ি হওয়ার মুখে শুধু এইটুকু জুড়ে দিল, যদি ইচ্ছা হয় মালাকে কোন চিঠি দিতে তো অরুণার চিঠির খামেই দিয়ে দেয় যেন, ও পৌঁছে দেবে।

ওখান থেকে মণীশ সোজা স্টেশনে চলে গেল।

গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছাতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। ঐ পুকুরঘাট। ওরা গা ধুতে এসেছিল, দুই বৌদিদি আর মালা। ওঁরা শেষ করে বাড়ির দরজার কাছে চলে গেছেন···একজন ভেতরে পা-ও দিলেন, মালা ভিজে কাপড়টা নিংড়াচ্ছিল, একবার মুখ তুলতে পুকুরের এপারে নজর পড়ে যেতে থেমে গেল ; তার পর কাপড়টাকে সেই অবস্থাতেই হাতে গুটিয়ে নিয়ে খবরটা দিতে হন্‌হন্ করে চলল বাড়ির দিকে। ওর এই ধারা।

মণীশ যখন পৌঁছল, সবাই দরজার কাছে জমা হয়েছে তাদের প্রশ্ন নিয়ে। মণীশ জানাল ব্যাপারটা, তার পর হঠাৎ আবার আসার কারণটা বলতে এমন একরাশ কথা এনে ফেলল যে, তখন না হোক, পরে নিজের কাছেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়তে হোল—

বলল—মনে করল হাতে যখন একটা দিন পাওয়াই গেল, তখন একবার দেখা করে বলে আসুক না।···তার পর স্কুলের একটা ব্যবস্থা করা হয় নি ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে······তার পর মনে হোল এই মাস দু-তিনের জন্যে মালারও পড়াশোনার একটা ছক করে দিয়ে গেলে মন্দ হয় না······একটা দিন যখন পাওয়াই গেল হাতে···

চা-জলখাবার খেয়ে, খানিকটা জ্যাঠাইমা আর বৌদিদিদের সঙ্গে গল্প করে, সেই উদ্দেশ্যেই মালাকে ডেকে তার সব বইপত্র একত্র করে তার পড়বার টেবিলে গিয়ে বসল।

ছক তৈরি করায় যথেষ্ট গোলমাল হয়ে যেতে লাগল।

একসময়ে বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে হাতটা হঠাৎ থামিয়ে মণীশ ডাকল—"মালা!"

ও চোখ তুলতে টেবিলে এলানো ওর বাঁ হাতটার ওপর নিজের হাতটা রেখে বলল—"সেদিন রুণাদি যা করলে তার মানেটা বোঝ তো ?"

মালার চোখ দিয়ে শুধু ছুটি ধারা নামল। কথা আর বেশী বাড়াল না মণীশ, বলল,—"তাকে ব'লো, আমি ভুলব না সে-কথা।"

এরপর যাতে সব মুছে দিয়ে মাঝখানে এই এগারো বৎসরের ব্যবধানটা এনে দিয়েছিল তা ছিল আরও সংক্ষিপ্ত।

ললিতমোহনের ঘরটা এই বারান্দারই একেবারে অন্য প্রান্তে। খামার থেকে ফিরে মণীশের আসার খবরটা শুনে অন্যমনস্ক হয়ে কখন আস্তে আস্তে এসে ঘরে ঢুকেছেন মণীশ টের পায় নি। নীচেই আছেন মনে করে দেখা করবার জন্য মালার টেবিল থেকে উঠে আসছে। সিঁড়ির কাছে আসতে ললিতমোহন প্রশ্ন করলেন —"মণীশ নীচে যাচ্ছ ?"

মণীশ ফিরে ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বলল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম নীচেই রয়েছেন।"

"ব'স।"—সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। বেশ একটু আনমনা রয়েছেন, যেন ভেতরে কি একটা চিন্তা চলছে।

প্রশ্ন-উত্তরগুলো হোল,—কেন ডেকেছিলেন—কতদিন থাকবে কাশীতে···তার মধ্যেই হঠাৎ যেন প্রসঙ্গটা বদলে ফেলেই ললিতমোহন বললেন—"হ্যাঁ, এসেছ ভালোই হয়েছে মণীশ—ইয়ে, আমি তো—দৈবনির্দিষ্টই বলব—এই তোমার আসাটা···একটা কথা ছিল।"

"বলুন।"

"অনেকদিন থেকেই বলব বলব মনে করছিলুম—তা কাছেই রয়েছ—আজকাল করে বলা হয় নি। সবার ইচ্ছেটা—আমার তো বটেই—তুমি অরুণাকে নাও।"

কি একটা বলতে গিয়ে রা সরল না, গলাটা এক মুহূর্তেই যেন

কাঠ হয়ে গেছে মণীশের। ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের পানে চেয়ে রইল। ভাগ্য যে, বুড়ো মানুষ, আর রাত্রি, মুখের চেহারাটা অত লক্ষ্য হোল না ললিতমোহনের।

প্রশ্ন করলেন—"কি বলছ?"

"একটু ভেবে দেখতে দেবেন না দাদু?"

"তা তো দেখবেই। বাড়িতেও জিজ্ঞেস করতে হবে, সে কি কথা! তবে উত্তরটা আমরা ধরেই নিলাম ভাই, অপাত্রীও তো নয়।"

২৬

বারাণসী।

প্রায় বছর পাঁচেক পরের কথা। মণীশ গঙ্গার একটি ঘাটে একলা বসে ছিল। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসে দূর স্মৃতির মতো ওপারের সবটুকু আবছা হয়ে এসেছে। আবছা হলেই চেষ্টা করে ফুটিয়ে তোলবার বাসনাটা জাগে মনে। তাই করছিল মণীশ, নদীর ওপার আর স্মৃতির ওপার একটার ঘাড়ে একটা এসে পড়ছিল; অলস মুহূর্তগুলোয় যেমন হওয়ার কথা।

দেশে ফিরে যাওয়া হয় নি। সম্ভব ছিল না আর ফিরে যাওয়া ললিতমোহনের ও প্রস্তাবের পর। সেদিক দিয়ে, সৎমায়ের অসুখ হয়ে এখানে আসাটা যেন বিধিনির্দিষ্ট বলেই মনে হয় মণীশের।… কিন্তু না যাওয়াও তো অত সহজ নয়, হৃদয়ের নূতন তন্তুগুলিতে টান ধরেছে তখন। দুটো দিক এক করে বরং এইভাবে বলা যায়—যাওয়া না-যাওয়া কোন্‌টা অসম্ভব ঠিক করতে কয়েকটা মাস কেটে গেল। তার পর, ঠিক করে ওঠবার আগেই মায়ের মৃত্যু ঘটল; প্রায় হঠাৎ।

উনি ছিলেন বাড়ির সঙ্গে মণীশের প্রায় একমাত্র বন্ধন। দুই

মায়ের মধ্যে ইনিই ছিলেন ছোট। তা হলেও, দুই ভাইয়ের মধ্যে এঁরই সন্তান, মণীশের বৈমাত্র দাদা যতীশ জ্যেষ্ঠ আর মণীশ কনিষ্ঠ।

পাঁচটি ভাইবোনের মধ্যেই ও সর্বজ্যেষ্ঠ আর মণীশ সর্বকনিষ্ঠ। সন্তানের অভাবেই মণীশের পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। একটি পুত্র আর তিন কন্যার পর প্রায় বারো বৎসরের ব্যবধানে মণীশের জন্ম হয়। একরকম সূতিকাগৃহেই তাকে সপত্নীর হাতে তুলে দিয়ে মণীশের মাতা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আর মা জানে নি মণীশ। সৎমাও যেন নাড়ীর বেদনা নিয়েই মানুষ করে তুলেছিলেন তাকে। সবই ঠিক চলছিল, তার পর দাদার বিবাহের বছর তিনের পর থেকে বাড়ির হাওয়া ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল। কয়েকটা বাড়ি আর কিছু জমি-জমা নিয়ে বিষয়-আশয় রয়েছে। নূতন বধূ বাপের বাড়ি থেকে পরামর্শ এনে সন্তর্পণে স্বামীর কানে তুলে দিয়ে তার মনটা ধীরে ধীরে লুব্ধ করে তুলল। আদর্শবাদী মণীশ কিছু বুঝতে চাইল না, কিন্তু আদর্শবাদী বলেই ধীরে ধীরে বাড়ির হাওয়াটা তার কাছে বিষাক্ত হয়ে উঠল।

এখানে এসে বসলে চার বৎসর পূর্বের এইরকম একটি সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে যায় মণীশের। এখান থেকে মণিকর্ণিকার ঘাটটা আংশিক দেখা যায়। ঐখানে মায়ের দাহকর্ম সম্পন্ন হয়েছিল। মণীশের মনে হয়েছিল সংসারের সঙ্গে তার সব সম্বন্ধও দগ্ধ হয়ে গেল। হ্যাঁ, দগ্ধই, কেননা সম্বন্ধ ছিন্ন হলে আবার গ্রন্থিবদ্ধ করা যায়, কিন্তু দগ্ধ হলে আর সে উপায় থাকে না।

খুব মর্মলীন একটা শ্মশান-বৈরাগ্য। এর একটা ফল এই হোল যে ওদিকে যে এতদিন একটা দ্বন্দ্ব চলছিল—মালা কিংবা অরুণা—সেটা যেন নিস্তেজ হয়ে গেল। দীর্ঘ অদর্শনেও খানিকটা কাজ হয়েছে। মনে হোল, এই তো বেশ চলে যাচ্ছে—নাইবা কেউ এল জীবনে। মালা কিংবা অরুণা, কেউই। সব তীর্থের হাওয়াতেই একটা বৈরাগ্যের সুর আছে, বিশেষ করে বারাণসীর হাওয়ায় তো

বটেই ; এর দেবতাই হচ্ছেন শ্মশানচারী। কতকটা এই হাওয়াও করল সহায়তা ; ফলে, যা ছিল মাত্র শ্মশান-বৈরাগ্যই তা যেন স্থায়ী আসন নিল ওর জীবনে। এদিকে কলিকাতা, ওদিকে অরুণা মালা, আর সবাইকে নিয়ে অরুণাদের গ্রাম বিবর্ণ হয়ে গেল, সমস্ত চিত্রটুকু প্রায় মুছে গেল।

গোটা দুই চিঠি দিয়েছিল অরুণাকে, একেবারে গোড়ার দিকে ; শুধু কেমন আছ, ভালো আছি এইটুকু ; উত্তরও পেয়েছিল ঐ সুরেই, তার পর আর দেয় নি চিঠি। ললিতমোহন আর মালাকে একেবারেই নয়।

দাদা মায়ের মৃত্যুর পর মাস ছয়েক টাকা পাঠিয়েছিলেন পুরোপুরি। তার পর সেটা কমে এল। কোন আপত্তি করল না মণীশ। মাস পাঁচেক পরে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তাতেও কিছু আপত্তি করল না। শুধু না যাওয়ার সংকল্পে যদি বা কোথাও কোন ফাটল ধরেছিল, সেটা গেল বুজে। অভিমানও তো বৈরাগ্যই।

কিন্তু বৈরাগ্যের পরেও জীবনের অনেকখানি যায় থেকে। সেই অবশিষ্ট জীবন তার দাবি নিয়ে এসে দাঁড়াল ; কাল কি হবে তার ভাবনা। কাজ ধরতে হোল, সবচেয়ে সস্তার কাজ একটা মাস্টারি যোগাড় করতে বিশেষ বেগ পেতে হোল না। তার পর যা সব বৈরাগীর ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে—এই অবলম্বন ধরে জীবন আবার ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে লাগল, সেই খণ্ডিত জীবন আবার পূর্ণতর হয়ে উঠতে চাইল।

তারই মধ্যে ওর জীবনে এসে পড়ে সুনন্দা, সে আজ প্রায় এক বৎসরের কথা।

মণীশের জীবনে অরুণা এসেছিল তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে, মালা এসেছিল করুণার মধ্যে দিয়ে, সুনন্দা এসেছিল তার সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে, রূপের মধ্যে দিয়ে।

এ সেই রূপ যা প্রথম দর্শনের মুহূর্তেই আর সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে একক হয়ে বসে জীবনে; একমাত্র কাম্য, যা না হলে জীবনের যেন কোন অর্থ ই থাকে না আর।···সেই অতি তীব্র অনুভূতি যাকে ভুল করে বলি—দেখা মাত্রই ভালবাসা।

আজ সুনন্দা আর নেই ওর জীবনে, সরে গেছে। এও এক ধরনের মৃত্যু, মৃত্যুর মতোই বৈরাগ্য এনে দিয়েছে নতুন করে, আর সেই জন্যই সুনন্দাকে ভালবাসার প্রকৃত স্বরূপটা বুঝতে পারছে কতকটা মণীশ। এতদিন একেবারেই পারে নি।

মনে হয়েছিল জীবনে যা কিছু অপচয়, বাড়িঘর, স্বজন-পরিজন, অরুণা-মালা, সব সার্থক হয়ে উঠতে চলেছে এই এক সঞ্চয়ে, অর্থাৎ সুনন্দাকে পাওয়ায়। যা সরিয়ে নিলেন তার জন্য বিধাতাকে মনে-প্রাণে ধন্যবাদ দিয়েছিল মণীশ, তাঁর বিধানে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠেছিল; এতবড় একটা প্রাপ্তির জন্য সুপ্রসার ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে না? তাই তো করেছেন তিনি।

আজ দৃষ্টির সামনে চিতাধূমায়িত মণিকর্ণিকার শ্মশান, সব লাভ-ক্ষতির চিতাবহ্নিতে দৃষ্টি হয়ে এসেছে স্বচ্ছ। সুনন্দা গিয়ে, অরুণা মালার বিবর্ণ চিত্রটা আবার মনে খানিকটা রঙে-রেখায় ফুটে উঠেছে। মণীশ ভাবছে অত বড় একটা ভুল কথা ভাবতে পেরেছিল কি করে!

শুধু কি তাই? দেশ ছেড়ে আসার পর প্রায় চার বছর ধরে জীবনটা যে বাঁচবার উদ্দেশ্য হারিয়ে ধীরে ধীরে অবসাদগ্রস্ত হয়ে আসছিল, তাতে আবার নতুন করে প্রাণসঞ্চার হয়েছিল যেন; ঐ সুনন্দাই উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে।······বাঁচবার মতো করে বাঁচতে হবে, সুনন্দার যোগ্য হয়ে। খেতে হবে, পরতে হবে, থাকতে হবে, আর পাঁচটা মানুষ যেমন খাওয়া-পরা-থাকার বাসনা নিয়ে বাঁচতে চায়।·· ভালো চাকরির চেষ্টায় ঘুরল-ফিরল; মাস্টারিতে সুনন্দার বিরাগ, অন্য কিছু পাওয়ার আগেই সেটা দিল ছেড়ে, এমন কি বিষয়-আশয়ের খোঁজ ক'রে, খানিকটা অন্যায়ের অনুযোগ নিয়ে

দাদাকে চিঠিও দিল। এক কথায়, বাঁচার মতো বাঁচবার জন্য মেতে উঠল মণীশ।

সুনন্দা অপূর্বসুন্দরী। চোখ-ধাঁধানো তার সৌন্দর্য।

সেই জন্যেই ভুলে বসেছিল মণীশ যে তাতে অন্য আরও চোখ তো ধাঁধিয়ে যেতে পারে। আরও একটা এর চেয়েও বড় ভুল করেছিল; যে সুন্দর তার চোখ দুটিও যে সৌন্দর্যেই ধাঁধাবে তার মানে কি? চোখ ধাঁধাবার আরও কত কি রয়েছে।

আজ তিনদিন হোল সুনন্দা বিবাহ করেছে। পাত্র জমিদার। অবশ্য গায়ের গন্ধ ছাড়া জমিদারির গৌরবের আর আছে কি? তবে গাড়ি আছে, শহরে বাড়ি আছে, কয়েকখানাই, আর আছে মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স।

সুনন্দা হোল পাত্রের দ্বিতীয়পক্ষ; অবশ্য প্রথম পক্ষ নেই। পাত্রটি বাঙালী নয়, এদেশী।

কার পক্ষে কিসের রূপ যে চোখ-ধাঁধানো তা কে বলবে?

আজ একটা নতুন চাকরি পেয়ে মণীশ সন্ধ্যায় এখানে এসে বসেছিল; মনটা যখন খুব বড় রকম একটা নাড়া পায়, বসে এখানে এসে কখনও কখনও। চাকরিটা লক্ষ্ণৌয়ের একটা বড় অফিসে, মাইনে বেশ ভালো। ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছিল, আজই খবরটা পেয়েছে।···আচ্ছা, খবরটা যদি দিন দশ-বারো আগে পাওয়া যেত, আসত কি সুনন্দা?······একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল। দিন পনেরো আগে,—হ্যাঁ, আজ সোমবার, সেটাও সোমবারই ছিল—ও আর সুনন্দা বেড়াতে বেড়াতে এইখানে চলে এসেছিল। সুনন্দাই বলল—"বসবে?"

বসতেই যাচ্ছিল, দুজনেই, হঠাৎ মণীশের কি খেয়াল হোল, বলল—"না, চল অন্য জায়গায় গিয়ে বসি।"

"কেন? বেশ চমৎকার জায়গাটি তো।"—সুনন্দা বলল। মণীশ একটু হেসে উত্তর করল—"শ্মশানের ওপর দৃষ্টি রেখে জীবনের কথা ভাবা যায় না।"

সুনন্দাও হাসল, বলল—"তুমি বড় খুঁতখুঁতে।"

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে কি যেন ভেবে নিল, তার পর সেই-ভাবেই বলল—"আমি তো বলি শ্মশানের ওপর দৃষ্টি রেখেই জীবনের কথা ভাবা ঠিক; মনে থাকে কিছুই জড়িয়ে ধরবার মতন নয়।"

ওর প্রথম কথারই চমৎকার একটা উত্তর যুগিয়ে গেছে, মণীশের মনটা সেই দিকেই ছিল, এটা এড়িয়ে বলল—"খুঁতখুঁতের কথা বলছ সু, আমি তো বলি খুঁতখুঁতে না হলে দুনিয়ার হাটে বাছাই করা জিনিসটা পাওয়া যায় না। এই ছাখো না, আমি পেয়ে গেছি।"

একটু জড়িয়েই কাঁধে হাতটা দিয়েছিল।

বেশ কৌতুক মনে হচ্ছে, দুজনের কথাই ফলে গেল, শুধু একটু ওলট-পালট হয়ে। সুনন্দারটা ফলল মণীশের বেলায়, মণীশেরটা ফলল সুনন্দার বেলায়।

দুনিয়ার হাটে সুনন্দা বাছাই করা জিনিস খুঁজছিল; পেয়ে গেছে।

সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এল। মণিকর্ণিকার ঘাটে চিতার সংখ্যা বাড়ল, একটি নির্বাপিতপ্রায় হয়ে এসেছিল, তার পাশে দুটি নূতন উঠল জ্বলে।

কেমন একটা জিদ ধরে গেছে, আজ এইখানে বসেই জীবনের কথা ভাববে মণীশ।

…এবার আর এভাবে নয়; এবার জিনিস কিনবে বীর্যশুল্কে! সুনন্দাকে পেতে হবে। লক্ষ্ণৌয়ের চাকরিটা নেবে না। এইখানেই থাকবে, থেকে ভাঙন ধরাবে সুনন্দাদের জীবনে। জানে এসব বিবাহ স্থায়ী হয় না, ও থেকে গিয়ে ভাঙনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।…

…আর, দাদাকে ওভাবে লেখাও নয়, ন্যায়ের কথা তুলে মিনতি। এবার থাকবে ন্যায়ের পাশে কড়া দাবি। উকিলের চিঠি দেবে মণীশ।

সংকল্পটা স্থায়ী হয় নি। চাকরি নিয়ে লক্ষ্ণৌয়ে এল মণীশ।

স্থায়ী হয় নি, কিন্তু একেবারেই যে গেছে এমনও নয়। আসল কথা, জীবনের প্রতি ভঙ্গিটাই কবে থেকে যেন গেছে বদলে, বোধ হয় সুনন্দাকে দেখার পর থেকে। কেমন একটা আস্থা এসে গেছে জীবনে, সন্দিগ্ধদৃষ্টি নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করবার মতো জিনিস নয়, এগিয়ে যেতে হবে, ভোগ করতে হবে।

লক্ষ্ণৌয়ে কাজ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা নেশা ধরে গেল। কতকটা কাজের গুণেও আবার কতকটা জায়গার গুণেও। এবার আর ঝিমুনো নেশা নয়, কর্মের উন্মাদনা; আফিম নয়, সুরা। চারিদিকেই একটু ব্যস্ততা, 'রেস্'-এর দৌড়, করতে হবে, হতে হবে, পেতে হবে। জীবনটাকে জড়িয়ে পিষে উপভোগ করতে হবে।... আচ্ছা, ভালবাসাটা শুধু বাংলার নরম মাটির জন্যে নয় কি? ওখানকার সব ফসলই এই রকম নয়? শুধুই 'নেতি', শুধুই আত্মবলি, শুধুই চুল চিরে চিরে সূক্ষ্ম বিচার। এসব দিকে ততদিনে জীবন সুস্থ সবল পদক্ষেপে কতদূর যাচ্ছে এগিয়ে।

রেস্-এ নেমে পড়ল মণীশ।

একটু তাড়াহুড়াই আরম্ভ করে দিল, দেখল অনেকখানি পেছিয়ে রয়েছে। তাড়াহুড়ার মধ্যেকার সব কথা স্পষ্ট হয় না, সব মুখ দাগ কেটে বসে না মনে, তবু দু-তিনখানি আছে বসে—

সুচিত্রা ছিল মণীশদের অফিসের নিম্নস্তরের কেরানি যদুবাবুর মেয়ে। চাকরি নিয়ে একটা হোটেলে গিয়ে উঠেছিল মণীশ। বাসার খোঁজে ছিল। কিন্তু বেশ মনের মতো পাচ্ছিল না। কিছুদিন যাওয়ার পর হোটেল ছেড়ে একটা বাঙালীদের মেসে গিয়ে উঠল।

একদিন বিকালে অফিস থেকে এসে চা-জলখাবার খেয়ে বাইরে যাওয়ার জন্যে ঘরে তালা দিচ্ছে, বারান্দার ওদিক থেকে একটি ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন, প্রশ্ন করলেন—"বাইরে যাচ্ছেন?"

হেঁট মুখে তালা লাগাচ্ছিল মণীশ, মুখটা তুলে বলল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, কেন বলুন তো?"

সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ কুঁচকে বলল—"কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে?"

ভদ্রলোককে দেখে মনে হয় প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে গেছেন। চেহারাটা একটু পাকাটে, গায়ে একটা আধা-সুতির র‍্যাপার। হঠাৎ যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছেন; র‍্যাপারের মধ্যে থেকে একটা পুলিন্দার মতো কি বের করতে যাচ্ছিলেন, যেন একটু ত্রস্তভাবেই, আবার লুকিয়ে ফেললেন। উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মণীশ বলল—"আমাদের অফিসেই তো নয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ......তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, এই মেসেই এলেন? ..কদ্দিন হোল এসেছেন?"

কি রকম একটু মনে হওয়ায় বাইরে থেকে ঘুরে এসে পরিচয় জিজ্ঞেস করল মণীশ। বড় অফিস, তার একেবারে নীচের দিকের কেরানি, যাওয়া-আসায়, ওঠা-নামায় নজরে পড়েছে দু-এক বার, কিন্তু জানে না কিছু।

শুনল নাম যদু আদিত্য, ওদের অফিসেই অল্প মাইনের কাজ করেন। ভদ্রলোক দুঃস্থ। বাড়িতে মেয়েরা কিছু শেলাইয়ের কাজ, বুননের কাজ করে, তাই থেকে কিছু বাড়তি রোজগার করেন জানাশোনা মেস্ বা বাড়িতে বেচে।

কি মনে হোল, মণীশ জিজ্ঞেস করে বসল—"আচ্ছা উনি বাড়িতে পেইং গেস্ট (paying guest) রাখবেন?"

উত্তর হোল—তা তো জানে না কেউ, তবে মণীশ জিজ্ঞেস করে দেখতে পারে; আপিসেরই লোক তো। তবে অভাবগ্রস্ত লোক, উপকৃত হবেনই বলে মনে হয়।

পুলিন্দাটা লুকিয়ে ফেলবার কথা মনে করে মণীশ ওদেরই অনুরোধ করল জেনে নিয়ে ওকে বলতে। বলল—ওর একটা আলাদা ঘর দরকার, বাড়ি থেকে যতটুকু পৃথক সম্ভব। যা চাইবেন দিতে রাজী আছে।

ঠিক হোল কথাবার্তা।

একটা গরীব পল্লীতে বাড়িটা। কিন্তু হঠাৎ যেন বড় মনে লেগে গেল মণীশের। আসল বাড়িটা তিনখানি ঘর নিয়ে, খোলার চাল, বাড়ির দু দিকে একটু করে জায়গা। কিন্তু সমস্তটুকু কিছু ফুলের, কিছু তরকারির গাছপালা দিয়ে এমন ঢাকা যে মনে হয় যেন রুক্ষ-প্রকৃতি লক্ষ্ণৌয়ের মধ্যে সজল-সবুজ বাংলার এক টুকরো এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জমির একটাতে একটা মাঝারি গোছের ভাঙা ঘর—দেয়াল অর্ধেক পড়ে গেছে, মাথায় চাল নেই। আগাম টাকা দিয়ে মণীশ সেটা ঠিক করিয়ে নিয়ে উঠে গেল।

পরিবারটি খুব বড় নয়, ছেলেমেয়ে নিয়ে ছয়টি প্রাণী। কিন্তু একার আয়, তার ওপর স্ত্রী চিররুগ্‌ণা। এইতে পরিবারটি বিপর্যস্ত।

সুচিত্রা বড় মেয়ে। রান্না থেকে নিয়ে সব কিছুই একরকম তার হাতে। শেলাইয়ের কাজও কিছু কিছু । মা আর পরের বোনটিও কিছু কিছু সাহায্য করে।

বড় অদ্ভুত লেগেছিল সুচিত্রাকে। বাংলা থেকে এতদূরে এমন ষোল-আনা বাঙালী মেয়ে এই প্রায় ছয় বছরের মধ্যে চোখে পড়ে নি। সবই করতে হয়, সবই দেখতে হয়, কাজেই বেশ সপ্রতিভ; খানিকটা চঞ্চলও, কিন্তু তবুও মনে হয় একটি অচপল শ্রী যেন ওকে চারিদিক থেকে ঘিরে রয়েছে।

এটা আগে ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি মণীশ। মনে হত এটা যেন ওর সহজাত কবচ একটা, ওকে রক্ষা করবার জন্যে। তাই মেলামেশা, কথাবার্তা সবই হয়ে গেছে, কিন্তু যেন ঘেঁষতে পারে নি বহুদিন পর্যন্ত।

তার পর অনেকটা পেরেছিল; ছিল একসঙ্গে প্রায় বছরখানেক তো। দেখল ওটা কোন সহজাত কবচ নয়। একটা কৃত্রিম বর্ম; কোন কারণে সব কিছুর মধ্যে সুচিত্রা যেন অতিরিক্ত সতর্ক। কারণটাও আন্দাজের মধ্যে এসে পড়ল একদিন।

কথাটা প্রায় শেষ পর্যন্ত মণীশের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল। এই বাড়িতে, ঐ ঘরেই কয়েক বছর আগে তারই মতো আরও একজন যুবা ছিল, তারই মতো পেইং-গেস্ট হয়ে।

মনে হোল সে সময় যথেষ্ট সতর্ক হতে পারে নি সুচিত্রা।

তবুও প্রস্তুত ছিল মণীশ, ক্রমেই জীবনকে তো ঘেঁটে দেখছে। কথাটা তুলবে, বাপের কাছে, মায়ের কাছে, তার আগে মেয়ের কাছেই; এই সময়ে যদুবাবু হঠাৎ মারা গেলেন দিন তিনেকের অসুখে। বিপন্ন পরিবার, আরও সহজ হোল কথাটা তোলা। কিন্তু হঠাৎ একদিন শুনল, বাড়িটা বিক্রি করে ওরা দেশে চলে যাচ্ছে! হয়েও গেল বিক্রি, ওরা চলেও গেল।

এই একই বাড়ির সঙ্গে মণীশের জীবনের দুটি রঙিন স্মৃতি জড়িত। বাড়ি না বলে বরং জায়গা বলাই ঠিক, বাড়ি আর একই ছিল না।

সুষ্ঠু জীবনপ্রবাহের মধ্যে থেকে জীবন সম্বন্ধে ক্ষুধাটা প্রবলই হচ্ছে দিন দিন। তার পর, চাকরিটা অস্থায়ী গোছের ছিল, পাকা হয়ে যেতে পথটাও অনেকখানি পরিষ্কার হোল যেন। বয়সের ধর্মেই মুখ বাছাবাছি চলছিল, দু'একটা পড়েও ছিল চোখে, কিন্তু অনিশ্চয়তার জন্যই মণীশ সচেষ্ট হয় নি।

অফিসের লালফিতাবাজির মধ্যে পড়ে চাকরিটা পাকা হতে প্রায় বছর দুয়েক লেগে গেল। এদিকে এরই জন্য মনটা বড় চঞ্চলও ছিল, যেদিন খবরটা বেরুল, বেশ হালকা মনে হওয়ার জন্য হঠাৎ একটা খেয়াল হোল মণীশের; সেই বাড়িটার অবস্থা কি? কারা এল সেখানে?

ফিরে এসেছিল আবার মেসেই। বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ কথাটা মনে পড়তে ঐ পথেই এগুল।

প্রায় বছরখানেক পরে এল। অনেক বদলে গেছে পাড়াটা। আর সে দারিদ্র্যের ভাবটা নেই তত, অনেকগুলি ভালো ভালো

বাড়ি হয়ে বেশ খানিকটা শ্রী এসেছে, বিশেষ করে যতুবাবু যেদিকটায় থাকতেন। একটু চেনাও শক্ত যেন।

একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল, একটি ভদ্রলোক বারান্দায় বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন—"কার বাড়ি খুঁজছেন ?"

মণীশ বলল—"এখানে যতুবাবু বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন…"

"ছিলেন। আমি তাঁর কাছ থেকেই কিনি জায়গাটা। আপনার সঙ্গে কোন আত্মীয়তা ছিল ?"

সম্বন্ধটাকে ঠিক ও-পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা ভেবে নিতে যা কয়েক সেকেণ্ড দেরি হোল, তার মধ্যেই উনি বললেন—আত্মীয়তা ধরে নিয়েই বললেন—"তা হলে আসুন না উঠে। আমাদেরও আত্মীয়ই ছিলেন, অবিশ্যি একটু দূর সম্পর্কে।"

কি ভেবে আর কথা না বাড়িয়ে উঠেই গেল মণীশ।

প্রশ্ন করে জানল যতুবাবুর পরিবার দেশে গিয়ে ভালোই আছে। কলকাতা থেকে কয়েক স্টেশন দূরে বাড়িটা। জমিজমা ছিল কিছু, বড় মেয়েটির বিয়ে দিয়ে জামাইটিকে বাড়িতেই রেখেছেন যতুবাবুর স্ত্রী, সে-ই দেখাশোনা করে। নিজের স্বাস্থ্য তত ভালো না হলেও বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক তো, অনেকটা সামলে নিয়েছেন।…ভদ্রলোকের নাম শচীনাথ দত্ত। নিজে অবসর নিয়ে এই বাড়িটা করেছেন। একটু বেশী কথা কওয়ার বাতিক আছে, আর, অবসরপ্রাপ্ত মানুষের যেমন হয়ে থাকে, বোধ হয় লোক খোঁজেন, যার জন্য ওকে ডেকে নিয়েছেন।…চা-টোস্টও আনালেন।

গল্প-সল্প হচ্ছিল, এমন সময় একটি বছর কুড়ি-বাইশের মেয়ে গলি হয়ে এসে বারান্দায় উঠে পড়ল। হাতে চামড়ার স্ট্র্যাপে বাঁধা কতকগুলো বই, পরনে সালোয়ার, কুর্তা, উড়ুনি। শচীনাথবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন দু-পক্ষের—"আমার মেয়ে দীপা, কলেজে থার্ডইয়ারে পড়ছে—বি. এস্-সি।…ইনি হচ্ছেন মণীশ মিত্র। যতুদের আত্মীয়, এখানে তারই সেই অফিসে কাজ করেন।"

দু জনে নমস্কার বিনিময় করল। মণীশ একটু কি চিন্তা করছিল যেন। বলল—"ঠিক আত্মীয় নয়, রক্তের সম্বন্ধ নেই; কথাটা হচ্ছে, আমি যদুকাকার বাড়িতে পেইং-গেস্ট হয়ে ছিলাম অনেকদিন।"

শচীনাথ কথাটাকে আমল দিলেন না, একটু হেসে বললেন—"ঐ হোল, রক্তের সম্বন্ধ যে থাকতেই হবে তার মানে কি। একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে আহার।···দীপা, তুমি জল-টল খেয়ে এসো না, তা হলে বসিয়ে রাখি এঁকে।"

বসিয়ে রাখার একটা ছুতো পেয়েছেন আর কি।

আসা-যাওয়া মেলামেশা বেশ চলল কিছুদিন। মণীশের মনে হয়েছিল, এই ঠিক পাওয়া গেছে। দীপা সিধা, সপ্রতিভ, স্মার্ট, একটু বেশীই স্মার্ট; কিন্তু এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে এই যেন মানানসই। সুচিত্রা ছিল যেন বড় নরম, অতিরিক্ত বাঙালী; যেখানে গেছে সেখানকারই জিনিস!

যদুবাবুর পেইং-গেস্ট ছিল বলে শচীবাবুর ধারণাটা যে ভেঙে দিতে চেয়েছিল মণীশ তার একটা হেতু ছিল। চমৎকার অ্যামেরিকান স্টাইলের একতলা বাড়ি দেখেই শচীনাথবাবুর সঙ্গেও ঐ সম্বন্ধটা পাতাবার কথা মনে হয়েছিল তার, একটু ইতস্তত করছিল, পরে দীপা আসতে মন-স্থির করে ফেলল যেন। এও অবশ্য বুঝলে যে শচীনাথবাবুর পেইং-গেস্ট নেওয়ার দরকার নেই, তবু কথাটা বলে পথটা খুলে রাখল।

এগিয়ে চলল। বাড়তে লাগল ঘনিষ্ঠতা।

আট বৎসর হয়ে গেল দেশ ছেড়ে এসেছে। কত কি ঘটে গেল এর মধ্যে।···জীবনের লয়টা হঠাৎ বড় যেন দ্রুত হয়ে উঠেছে; কৈ হোল না তো কিছু পাওয়া! পেতে হবেই যে!

এইতেই বর্ত্তমানটা হয়ে পড়েছে একমাত্র সত্য। দীপার আগের আর সব মুখ হয়ে গেছে অস্পষ্ট, অত তীব্র-দ্যুতির সুনন্দা পর্যন্ত।

...তার আগে ছিল কি অরুণা বলে কেউ? আছে কি মালা বলে একটি মেয়ে কোথাও পথ চেয়ে বসে?

অনেক বন্ধুও এসেছে-গেছে এর মধ্যে, তার মধ্যে এখানে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে শ্রীনিবাস টনডনের সঙ্গে। অফিসে ওর সহকর্মী। সুপুরুষ, সবল, স্মার্ট যত হতে হয়, জীবন সম্বন্ধে ধারণাটা বেশ সুস্পষ্ট, অর্থাৎ ক্লীব দ্বিধা নয়, পূর্ণ পৌরুষে তাকে টেনে নিয়ে উপভোগ করতে হবে। টনডন কথাও বলে একেবারে চরমে ঠেলে নিয়ে গিয়ে। কথায় জোর দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে ইংরেজী এনে ফেলা একটা অভ্যাসের মধ্যে।

মণীশের সঙ্গে মিলেছে ভালো। পরামর্শ দেয় জীবন সম্বন্ধে, আলোচনা করে রোমান্স। মণীশ দীপার কথা ওকে বলল, যখন মনে করল খানিকটা এগিয়েছে। বলল, তুমি ঘটকালি কর। একদিন নিয়ে গেল সঙ্গে করে শচীনবাবুর বাড়ি, বলল, বিশেষ বন্ধু, ওর কাছে ওঁর পরিচয় পেয়ে দেখা করতে এসেছে। শচীনাথ টনডনকেও মাঝে মাঝে আসতে অনুরোধ করলেন।

কিছু আসর জমিয়ে নিয়ে টনডন মাঝে বাদ দিয়ে দিয়ে তিনদিন একলাও গেল, দু বন্ধুতে পরামর্শ করেই। শেষের দিন ফিরে এসে জানাল, শচীনাথবাবু পরের দিন ওকে চা'এ নিমন্ত্রণ করেছেন; অবশ্য দুজনকেই।

"ব্যাপার কি?" একটু আগ্রহের সঙ্গেই মণীশ শুধাল।

"প্রফেসর ঘোষাল এসেছেন কলকাতা থেকে..." কৌতুক-দৃষ্টি নিয়ে টনডন চেয়ে রইল মুখের দিকে।

"লোকটা কে?"

"মিস্ দাত্তার স্যুটার (পাণিপ্রার্থী)।"

একটু ভ্যাবাচাকা খেয়েই চেয়ে ছিল মণীশ, টনডনই বলল—"নেমে পড় না। Here is a chance for romance (এই একটা রোমান্সের সম্ভাবনা রয়েছে)। আর তোমার অব্যর্থ জিৎ। দেখলাম তো ঘোষালকে। অবশ্য বিলাতী ডিগ্রী রয়েছে, কিন্তু

দেখতে একটি বুল্‌ডগ (Bull dog), তা ভিন্ন absentee (অনুপস্থিত) সুটার তো, তোমার জিৎ অনিবার্য। Give fight, do (পড়োই নেমে লড়াইয়ে)।"

রীতিমত লড়াইয়েই নেমে পড়েছিল মিস্ দস্তিদারকে নিয়ে। সে একটা জীবনমরণ-পণ ব্যাপার।

আরও প্রায় বছরখানেক পরের কথা। এর মধ্যে লক্ষ্ণৌ যেন আরও জাঁকিয়ে আসন গেড়েছে মনে। দু-তিনটা সম্বন্ধ এসেছিল ; অনেকদিন তো আছে, তায় সোঁদা ছেলে, তায় পাত্র হিসাবে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সব কটাই যেন ঘরোয়া, চেহারা থেকে আরম্ভ করে প্রায় সব দিকেই। একটা যে ওরই মধ্যে একটু আকর্ষণীয় ছিল, তাও হচ্ছে-হবে করতে করতে মিলিয়ে গেল।

তার পরে এল মিস্ দস্তিদারের পালা।

মিস্ রীণা দস্তিদার এল মণীশের ডিপার্টমেণ্টের বড় সাহেবের টাইপিস্ট হয়ে। এল দিল্লী থেকে। গ্র্যাজুয়েট, পায়ে হাই-হীল জুতা, ঠোঁটে লিপ্‌স্টিকের টান, মাথার চুল বব্ করে ছাঁটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নেমে পড়ল মণীশ।

জীবনমরণ-পণ ভিন্ন আর কি! সাহেব বিলাতী সাহেব নয়, একজন পাঞ্জাবী। অবিবাহিতও, প্রায় গোড়া থেকেই বোঝা গেল মিস্ দস্তিদার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, না করাই অসম্ভব। তবুও যে নেমে পড়ল মণীশ তার কারণ কি বলা যায় ?—পুষ্প-ধন্বা অন্ধ ?

একটা কথা চেহারার দিক দিয়ে বড় সাহেবের সমরাঙ্গনে একটা অসুবিধা ছিল, টনডনের ভাষায় 'বুল্-ডগ্'ই। তাইতে কিছু কি উৎসাহ পেল মণীশ ?

সুখের বিষয়, বেশীদিন চলল না।

মাস তিনেক ছিল রীণা অফিসে। প্রচুর উৎসাহ দিল উভয় পক্ষকেই, প্রচুর দক্ষতার সঙ্গেই। তার পর একদিন উভয়পক্ষ থেকে

দক্ষতার সঙ্গে সংগ্রহ করা উপঢৌকনের স্তূপটি বাক্সবন্দী করে অদৃশ্য হোল।

শোনা গেল বম্বে গেছে অভিনেত্রীর চুক্তি নিয়ে। অনেক হৃদয়াকাশ ছুঁয়ে সিনেমার আকাশে জ্যোতিষ্ক হয়ে ফুটতে গেল আর কি।

টনডন সান্ত্বনা দিল—"চুলোয় যাক, তুমি নিজেকে তোয়ের করে নাও, কাজে গাফিলতির কানাঘুষো হচ্ছে। একটা lift (উন্নতি) রয়েছে সামনে, এগিয়ে যাও। Take care of number one and girls will jump at you (নিজেকে গড়ে তোল, মেয়েরা আপ্‌সে ঝাঁপিয়ে পড়বে)।

অন্য আকাশে যা-ই হয়ে ফুটুক, মণীশের আকাশে ধূমকেতু হয়েই উদয় হয়েছিল রীণা দস্তিদার। রোমান্সের ব্যাপারটা বহুদিন গোপন রাখতে সমর্থ হয়েছিল, কিন্তু শেষের দিকে আর থাকে নি। এ-সাহেবের সঙ্গে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। অতি কষ্টে চাকরিটা বজায় রেখে মীরাটে বদলি নিয়ে চলে গেল মণীশ।

ধাক্কাটায় জীবন সম্বন্ধে বেশ সচেতন করে দিল।

বয়স এগিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গেছে জীবন সম্বন্ধে, বয়সে, আবার বিচিত্র অভিজ্ঞতার জন্যও। দেখছে মেয়েছেলে বাদ দিয়েও জীবনে অনেক কিছু পাবার আছে, নির্ঝঞ্ঝাট অদ্বৈত জীবনে বোধ হয় আরও ভালো করেই।···ফ্রাস্‌ট্রেশন—? ব্যর্থতার অভিমান? হতেও পারে।

মীরাটে পালিয়ে আসতে হয়েছিল চাকরির সিঁড়িতে দু ধাপ নেমেই। সেই দিকেই দিল মন। আর ঘুরে চায় নি ওদিকে এই দুটো বৎসর। একটা কথা ওর হয়ে বলতেই হয়, মনটাকে এমন কোঠায় টেনে তুলেছে, আর কোনও মেয়ে ঝাঁপিয়ে এলেও আমল দেবে না।

হোলও তো তাই।

এগিয়ে গেছে মণীশ। চাকরি ধ্যান-জ্ঞান করে যে তপস্যা তাতে সিদ্ধিলাভ করেছে। ও নিজেই এখন একটা বিভাগের চার্জে, বড় সাহেব না হোক, মাঝারি গোছের একজন তো বটেই আজ।

টনডনের একটা চিঠি এসেছিল।

মিস্ দাত্তার সে-সম্বন্ধটা ভেঙে গেছে। প্রফেসার ঘোষালকে যে ওর শেষ পর্যন্ত বরদাস্ত হবে না এ সংশয় টনডনের ছিল, মণীশ মিছেই ভড়কে গিয়ে পিছু হটে গেল। অবশ্য মিস্টার দাত্তা সবটা ভাঙলেন না, তবে টনডনের আন্দাজটা ভুল নয় নিশ্চয়ই।

জিজ্ঞেস করছিলেন মণীশের কথা, বেশ কৌতূহলের সঙ্গেই—কি করে, বিয়ে করলে কিনা?……সুবর্ণ সুযোগ। এগুবে টনডন?

উত্তরে মণীশ লিখল—I have wiped off the whole blessed lot from my memory, অর্থাৎ সব কটাকেই স্মৃতি থেকেমুছে ফেলেছে।

কিন্তু সত্যই কি পেরেছে মুছে ফেলতে?···ওর চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে দিয়েই অফিসের চাপরাসী পাণ্ডে এসে ছুটির জন্যে আবেদন জানাল; তার গাঁয়ের বাড়িতে তার স্ত্রী অসুস্থ।··· সে না গেলে কোনমতেই বাঁচবে না···হয়তো বাঁচবেই না, একবার শেষ দেখা দেখতে যাওয়া……

এগারো বৎসরের ওধারের একটি অতি-ক্ষীণ স্মৃতি হঠাৎ অতি-স্পষ্টই হয়ে একেবারে অভিভূত করে ফেলল। তার জন্যেও কোন একজনের কোথায় প্রতীক্ষা করে থাকবার কথা না?···হ্যাঁ, মালার।···কিন্তু আছে কি আজও?

চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে মণীশ।

গাঁয়ে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, পরিবারটিতেও। কম দিন হোল না তো।

গাঁয়ের পরিবর্তনের মধ্যে কিছু বাড়িঘর বেড়েছে, রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে ; বড় পরিবর্তনের মধ্যে ললিতমোহনের দেওয়া সেই জায়গাটার ওপর মেয়েদের একটা স্কুল হয়েছে। চেষ্টা চলছে সেটাকে হাই স্কুলে পরিণত করবার। মোটের ওপর গ্রামটা যেন আগের চেয়ে অনেকটা সজীব।

পরিবারের পরিবর্তনটা সময়ের দীর্ঘতার জন্য যেটুকু স্বাভাবিক মোটামুটি তাই। ললিতমোহন পুরোপুরি বৃদ্ধ এখন, জ্যাঠাইমা সাবিত্রী দেবীও ঐ পথে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। সিপ্রা পূর্ণ যুবতী, নরু স্কুল প্রায় পেরুবার মুখে। নতুন গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে আরও এসেছে সংসারে, কিন্তু সংসারটা বাড়ে নি, তার কারণ ষষ্ঠীচরণের ভাই করালীচরণ তার পরিবার নিয়ে কর্মস্থানে। অচলনাথ আছেন কলেজের কাজ নিয়েই কলকাতায়।

একটা বড় পরিবর্তন যা হতে পারত, হয় নি। অরুণা করে নি বিবাহ, সুতরাং স্থায়ী ভাবেই বাড়িতে আছে। আশ্চর্য হয় নি মণীশ, এইরকমটাই যে দাঁড়াবে সেটা তো একরকম জানাই। অরুণা বি. এ. পাশ করেছে ; ঐ স্কুলটার হেড-মিস্ট্রেস এখন।

কিন্তু জীবনে বিশেষ পরিবর্তন না হলেও চেহারাতে বেশ খানিকটা হয়েছেই, যেটা অন্তত এমন একজনের চোখে না পড়েই পারে না যে একটানা এগারো বৎসরের পর দেখল তাকে। পরিবর্তনটা শুধু বয়সের জন্যও নয়। অরুণার চেহারায় একটা পুরুষালি ভাব আগাগোড়াই ছিল, কিন্তু, তাতে কমনীয়তার অভাব হয় নি। ও যেন ছিল অর্ধনারীশ্বরের ছাঁচে ঢালা, যাতে পুরুষের ভাবটা নারীর ভাবটুকুকে আরও ফুটিয়ে একটা অনির্বচনীয়তা এনে

দিয়েছিল। এখন সেটা একেবারেই না হলেও অনেকখানি গেছে। গাল দুটো একটু চড়িয়ে গিয়ে সিধা নাসিকাটা হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ। আগে সামান্য সংশয় বা উত্তেজনাতেই যেখানে ভ্রূ-দুটি জুড়ে একত্র হয়ে যেত, সেখানে দুটি স্থায়ী রেখা পড়েছে। সব মিলিয়ে একটা যেন ক্লান্ত, নির্লিপ্ত ভাব।

অবশ্য ভেতরে ভেতরে; যার দৃষ্টি বেশী সন্ধানী তার চোখেই পড়বে শুধু। বাইরে বাইরে সেই অরুণাই রয়েছে—সতর্ক, কর্মতৎপর, খানিকটা কৌতুকপ্রবণও সুযোগ হলে।

ঘুম থেকে ওঠার পর মণীশের সঙ্গে অল্পই গোটা কতক কথা হোল, তার সবটাই ওর দীর্ঘ যাত্রাপথ নিয়ে। এক সময় একটু সতর্ক হয়ে উঠেই বলল—"তা উঠেছ যখন, উঠেই পড় মণীশ, আর কত ঘুমুবে? আমি ততক্ষণ বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি, সকালে একটু কাজ থাকে। এসে গল্প করব।"

ছেলেমেয়ে যারা জুটেছিল তাদের সরিয়ে দিল, বলল—"মুখহাত ধুয়ে নিতে দে, তার পর তো আছেই।"

মণীশকে প্রশ্ন করল—"কি গো, আছ তো, না রিটার্ন টিকিট?"

মণীশ হেসে বলল—"দেখছ রিটার্ন-টিকিট এখানকারই করা ছিল…"

"বটেই তো, মনে ছিল না। নৈলে এত তাড়াহুড়ো করে ধূলো-পায়েই চলে আসে লোকে!"

ঘুরে একটু হেসে ভ্রূ নাচিয়ে ওদের দু হাতে গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে একবার বলল—"তোয়ের থেকো মণীশ, এসেই একটু পরে আবার আমার স্কুলে বেরিয়ে যাব।"

মণীশ দরজার দিকে এগিয়ে এসে বলল—"আমিও ততক্ষণ না হয় একটু ঘুরে আসি না? আমার অবিশ্যি অকাজের ঘোরা।"

"তাই না হয় এসো।"—বলে নেমে গেল অরুণা।

কথাটা মণীশ বলে রাখল, তার কারণ বাড়িতে যেন মন টেঁকছে না। কাল থেকেই লক্ষ্য করছে, সেই প্রথম আসার একটা চাঞ্চল্যের পর থেকেই কেমন যেন একটা ছমছমে ভাব সবার, বিশেষ করে বড়দের মধ্যে। এর সঙ্গে ললিতমোহনের সেই বিবাহের প্রস্তাবের একটা সম্বন্ধ থাকা সম্ভব ভেবে একটা অস্বস্তি লেগে রয়েছে মনে। কিন্তু সে না হয় ললিতমোহন, জ্যাঠাইমা, তারপর হদ্দ ষষ্ঠীচরণ আর বড়বৌদিদি পর্যন্ত ; অরুণার ভাবটা যেন আরও কি রকম। কাল রাত থেকে এই রকম ফাঁকতালে বার তিন-চার এল, গোটা কতক করে এদিক-ওদিকের কথা, তার পরই আবার কাজের নাম করে চলে গেল। অবশ্য কাজের মানুষ ও বটেই, কিন্তু তাতে যেন সবটা ধরা পড়ছে না, খানিকটা কী থেকেই যাচ্ছে।

সেটার পূর্ণতা খুঁজছে অন্য এক ব্যাপারে মণীশ। লক্ষ্য করছে একেবারে ছোট দু-তিনটি ছাড়া বাকি সবাই—নরু সিপ্রা নিয়ে চার জন, ওকে যেন কতকটা পরিহার করেই চলেছে। সিপ্রার সম্বন্ধে একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়, গোড়াতেই ললিতমোহন এমন একটি রসিকতা করেছেন তাকে টেনে, কিন্তু নরু আর তার পরের দুই ভাইবোন সম্বন্ধে তো সে কথা খাটে না।

যতই মিলিয়ে দেখছে, ওর মনে হচ্ছে একটা কিছু কথা সন্তর্পণে গোপন রাখার চেষ্টা চলছে। আর, অরুণাই আছে এর গোড়ায়। আর, এটা যে মালাকে নিয়েই তাতেও আর কোন সন্দেহ নেই।··· আশ্চর্য, কারুর মুখেই মালার নামটাও শুনল না এ পর্যন্ত।

তার নিজের দিকেও গলদ রয়েছে। কে কখন্ কোন্ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে বসে ; ললিতমোহন-জ্যাঠাইমার একরকম, অরুণার একরকম ; ষষ্ঠীচরণ আর বৌদিদি আবার কতটা শুনেছে, তাদের প্রশ্ন কী নিয়ে হবে কে জানে।

চা-জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বেশ খানিকটা ঘুরল দেখেশুনে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেশ হালকা মনে হচ্ছে। সবচেয়ে স্বস্তি মনে হচ্ছে, মনটাকে মুক্ত করে

দিয়ে মালার কথাটা ভাবা যাচ্ছে। কি হোল তার? কি হওয়া সম্ভব? সব চেয়ে দুর্বোধ্য—এত গোপনীয়তা কিসের জন্য তাকে নিয়ে?...এদিকটা আরও যেন রহস্যময় হয়ে উঠল জ্যাঠাইমার একটা কথায়—

মালা বেশী বাড়ির বাইরে হত না, তবু কয়েকটা জায়গা তার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত আছে। তার একটা একটু দূরে, কানানদীর তীরে।

এগারো বৎসরের ওদিককার কথা। বাড়ির ছেলেমেয়ে আর অরুণার স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে পিক্‌নিক্ করতে গিয়েছিল সবাই। এরা সবাই রান্নার দিকে, মণীশ একটু নিভৃত দেখে একটা জায়গায় গিয়ে বসেছিল, কিছুক্ষণ পরে অরুণা খুঁজতে এল। একটা মতলব ঠিক করেই মালাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। যাওয়ার সময় তাকে বসিয়ে রেখে গেল, বলল—"চৌকিদারি কর্ বসে, ঘর-পালানে বিবাগী মানুষ, কোথাও চলে যেতে পারে।"

খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে সেই জায়গাটায় যাচ্ছিল মণীশ, খানিকক্ষণ নিরিবিলিতে বসবার জন্যই; বাধা পড়ল। আজ সকাল থেকেই একটা জোর বাতাস বইছে, শেষ রাত্রের দিকে কখন সুরু হয়ে থাকবে, সেটা হঠাৎ আরও প্রবল হয়ে উঠল খানিকটা। একটা বড় আমবাগানের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, বেরিয়ে দেখল বেশ মেঘও কখন জুটে গেছে একটা। ফিরতে হোল।

বাড়িতে এসে দেখল অরুণা স্কুলে চলে গেছে, আরও যাদের যাওয়ার কথা—ষষ্ঠীচরণ, নরুরা তিন ভাই বোন; বাড়ি অনেকটা খালি। ও ললিতমোহনের সঙ্গে দেখা করতে ওপরে যাচ্ছিল, বড় বৌ বললেন—"তাড়াতাড়ি চান করে খেয়ে নাও মণীশ ঠাকুরপো। দেরিও হয়ে গেছে, তা ভিন্ন বোধ হয় বিষ্টি নামবে।...লক্ষণ ভালো নয় বাপু। পাঁজি দেখেছ তো, এবারেও পূজোয় সেই যেমন শোনা যায় আশ্বিনের ঝড়ের কথা, তাই না হয়।"

জ্যাঠাইমা বললেন—"আশ্চর্যি কি বলো! যা অনাচার

চারিদিকে। না, খেয়ে দেয়ে নাও মণীশ। জিজ্ঞেস করছিলুম, কোথায় গেল সে ? তুমিও তাড়াতাড়ি পাট তুলে নাও ওদিককার বড়বৌমা।"

ঝড়টা বেড়েই যাচ্ছে, ওদের কথাগুলো হাওয়ায় দোল খেয়ে উঠছে। মণীশের অবশ্য পাঁজি কি বলল না-বলল সে ভয় নেই, ওর মনে হচ্ছে এসবও যেন বাজে কথা তুলে আসল কথা চাপা দেওয়ার চেষ্টা। সেই জন্যেই খেতে বসে যেন কতকটা জিদ করেই কথাটা তুলল। তবে অনেক চেষ্টা করতে হোল, অনেক দ্বিধাসঙ্কোচ কাটিয়ে একেবারে প্রায় শেষের দিকে মুখ দিয়ে বের করতে পারল প্রশ্নটা।

খাওয়াতে বসেছেন জ্যাঠাইমা বৌদিদি দুজনে। গল্পই হচ্ছে, মাঝখান থেকে হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে মণীশ জিজ্ঞেস করে বসল—"হ্যাঁ, ভুলেই যাচ্ছি ক্রমাগত—মালা বলে একটা মেয়ে ছিল—সেই যে কোন্ এক বোষ্টম-বিবাগীর⋯ ⋯"

বড়বৌ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে উঠল। বলল—"চুপ কর তো একটু। মনে হোল যেন দাদু ডাকছেন ওপর থেকে।"

সঙ্গে সঙ্গেই পা বাড়াল। জ্যাঠাইমা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন—"সে কথা আর ব'লো না বাবা, পরের মেয়েকে ঘরে নিয়ে এসে শেষে বুঝি সবার হাতে হাতকড়ি⋯"

বড়বৌ সিঁড়ির ল্যানডিং থেকে ডাক দিল—"মা, একবার শীগগির আস্থন তো, আপনাকেই ডাকছেন।"

বেশ জোরেই ডাক দিল, হাওয়াটা রয়েছে তো। জ্যাঠাইমার স্বভাবে তাড়াহুড়োর ভাবটা কোন কালেই ছিল না, তবুও সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়লেন।

এবার ব্যাপারটা বড় যেন স্পষ্ট, খানিকটা রূঢ় বলেই মনে হোল মণীশের, এই কথার মুখে বড়বৌয়ের ওঁকে সরিয়ে ফেলা। মনটা কেমন যেন খিঁচড়ে গেল, ও-ও একটু ভেবে নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ল।

বড়বৌ যেন প্রস্তুতই ছিল, একটা কিছু ইশারা করে সাবিত্রী

দেবীকে ওপরে পাঠিয়ে দিয়ে নেমে এল। অনুতপ্ত ভাবেই বলল—“এ কি, উঠে পড়লে ঠাকুরপো ?”

মণীশও সামলে নিয়েছে ভাবটা, একটু উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করল—“কেন ডেকেছেন দাদু, বৌদি ?···খাওয়া তো আমার হয়েই গেছল।”

“ছাখো তো কাণ্ড!···ডেকেছেন মাকে কি জন্যে তা জিজ্ঞেস করাও হয় নি, তাড়াতাড়ি নেমে আসছি···”

বোধ হয় আর ঢেকে রাখা বিসদৃশ হয়ে যাচ্ছে মনে করেই পান দেওয়ার সময় কথাটা আবার তুলল—“তখন তুমি মালা বলে সেই মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করছিলে ঠাকুরপো···”

“সে শুনব'খন বৌদি, একটু চুন দেবেন।” বলে এবার মণীশ নিজেই থামিয়ে দিল প্রসঙ্গটা। তার পর চুন এনেও পাছে ও তোলে, আগেভাগেই বলল—“আমি একটু ঘুমুতে যাচ্ছি বৌদি, তিন দিনের ঘুম জমা হয়েছে, চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে।”

তাড়াতাড়ি ওপরে চলে গেল।

২৮

চাপা দিল প্রসঙ্গটা হঠাৎ একটা নতুন আশঙ্কা মনে ঠেলে উঠেছে বলে। ঘুমুবে কি, সেইটেই মনটাকে তোলপাড় করতে লাগল।

একটা কলঙ্ককাহিনী নয় তো! জ্যাঠাইমা হঠাৎ হাতে হাত-কড়ি পড়বার কথা বললেন কেন ?

সে এক মর্ম-ছেড়া দুশ্চিন্তা। এলোমেলো এই হাওয়ার মতোই নানা পথে ছুটে চলেছে। কলঙ্কস্পর্শ নাকি ? তা হলে তার পর কি হোল মালার ? কত সম্ভাবনা রয়েছে। অনুতাপে মনটা পুড়ে যেন ছাই হয়ে যাচ্ছে। সে-ই তো দায়ী।···কোথায়, কি ভাবে তার দুর্বহ কলঙ্কিত জীবন কাটিয়ে চলেছে মালা ?····· শুধু

একটা চিন্তায় এসে মনটা পাচ্ছে খানিকটা স্থিতি, খানিকটা যেন নিষ্কৃতি—মালা যদি জীবন থেকেই বিদায় নিয়ে থাকে!...হে ভগবান, যেন তাই হয়, তাই হয়। মণীশ যে ভালবেসেছিল তাকে।

খেয়াল হোল ললিতমোহনের সঙ্গে এখনও ভালো করে কথা হয় নি এসে পর্যন্ত। যা দুর্যোগ সুরু হয়েছে, কালা মানুষের সঙ্গে কথা চালানোও মুশকিল। তবু উঠে গেল মণীশ, মালার চিন্তা অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

ঘরের জানালা সব বন্ধ। ললিতমোহন দরজার কাছে একটা ইজি-চেয়ারে বসে ভাগবত পাঠ করছিলেন, মণীশকে একটা চেয়ার টেনে বসতে বললেন—"তোমার খোঁজ নিয়েছিলাম সকালে। বললে বেরিয়ে গেছে।"

কালা মানুষে আস্তে আস্তে কথা বলে, মনে করে গলাটা বুঝি জোর হয়েই যাচ্ছে। মণীশকে কিন্তু চেঁচিয়েই বলতে হচ্ছিল, হাওয়ার জন্যে একটু বেশী চেঁচিয়েই। গল্প হোল খানিকক্ষণ এ-বিষয় সে-বিষয় নিয়ে। এগারো বছরের ইতিহাসটাও ডালপালা বাদ দিয়ে খানিকটা বলল মণীশ। তারই মধ্যে হঠাৎ একবার ডান হাতটা তুলে ললিতমোহন থামতে ইশারা করে রগ দুটো টিপে ধরে একটু ভাবলেন। আজকাল ঐ একটা বয়সের মুদ্রাদোষ দাঁড়িয়েছে, তার পর বললেন—"ভীমরতি হয়েছে তো, মনেই নেই কি একটা কথা জিজ্ঞেস করব মনে করেছিলুম।...হয়েছে, বিয়ে-থা করেছ মণীশ?"

বুকটা ধক্ করে উঠল মণীশের, নিজেই বুঝল ললিতমোহন ওর পরিবর্তনটা ধরে ফেলেছেন, তাই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে একটু হেসে একটা ঠাট্টা করেই ব্যাপারটা হালকা করে দেওয়ার চেষ্টা করল; বলল—"অপরের বিয়ের কথা তো দাদু, মনে পড়ছিল না তাই।"

ললিতমোহন হেসে উঠলেন, বললেন—"মন্দ বল নি, তায়

আবার নিজের বিয়েটা একেবারেই সামনে কিনা, বেয়ারা জুটিয়ে নাগরদোলায় উঠলেই হয়। হ্যাঁ, তাহলে হয়ে গেছে বিয়ে ?"

"সময় কোথায় পেলুম দাদু ? শুনলেন তো সব কাহিনী।"

কাছ ঘেঁষেই বসেছে মণীশ ; প্রশ্নটা করতে ললিতমোহন ওর পিঠে একটা হাত তুলে দিয়েছিলেন, একটু কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল হাতটা। একটু চুপ করে রইলেন। যে কথাটা এবার আসছে তার প্রতীক্ষায় সমস্ত দেহটা যেন অসাড় হয়ে গেছে মণীশের। ললিতমোহন চোখ দুটো নামিয়ে নিয়েছিলেন, ওর মুখের ওপর তুলে বললেন—"তা হলে……দেখছই তো ভাই, এদিকেও সময় হয়ে ওঠে নি। রুণার কথা বলছি, একবার বলেও-ছিলুম তোমায়।…কি বল তাহলে ?"

এসে পর্যন্ত ধাক্কার পর ধাক্কা ; আর যেন সইছে না, কিছু একটা হয়ে যাক, কোনখানে একটা ছেদ পড়ুক। সেবারের মতো "ভেবে দেখছি" বলবার ক্ষমতাটাও হারিয়েছে মণীশ, এমন কি, অরুণা রাজী হবে কিনা সে-কথাও তুলল না। বলল—"বেশ, যেমন ভালো বোঝেন করুন দাদু।"

এরপর আর কি কথা থাকবে ? বলেই বেরিয়ে এসেছে, দ্যাখে দরজা থেকে একটু সরে দেয়াল ঘেঁষে বড়বৌ রয়েছে দাঁড়িয়ে। একটু থতমত খেয়ে গেলই, কিন্তু বিশেষ অপ্রতিভ না হয়ে একটু হেসেই বলল—"এই যাঃ, ধরা পড়ে গেলুম ! কিন্তু ভাই, শুনতে আসি নি, সত্যি বলছি, তবে জানই তো আমাদের আড়িপাতা রোগ একেবারে ধাতের সঙ্গে মেশা…"

হেসে বলল মণীশ—"আর এমন ধাতের সঙ্গে মেশানো কথা…"

"সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলুম—লোভ সামলাতে পারলুম না কানে যেতে।…থাক্ ও-কথা, এখন জবাব দাও তো—যা বললে সত্যি তো, মনের কথাই তো ?"

"এমন কথাও মনের কথা হবে না ?"—আবার একটু হাসল মণীশ।

"তাহলে লাগি সবাই মিলে ?"

"আকাশের দুর্যোগটা কাটতে দেবেন না একটু ?"

দুজনেই একটু হেসে উঠল। বড়বৌ বলল—"না ভাই, ঠাট্টা নয়। আর, তা যদি বললে তো আমি তো দুর্যোগ কাটা এ'কেই বলি, এগারো বছর কোন খোঁজ-খবরই নেই—যার দুর্যোগ তার কাছে সেটা যে কী দুর্যোগ তুমি বেটাছেলে হয়ে কি বুঝবে বল ?"

কী একটা হঠাৎ এসে গেল মাঝখানে, হালকা ভাবটা গেল সরে, দুজনে একটু চুপ করে রইল। তার পর মণীশই বলল— "এবার আমার জিজ্ঞেস করবার পালা—যা বললেন সেটা কি সত্যি বৌদি ? মানে, ঠিক মন জেনে বলছেন ওর ?"

"না জানলে কোন্ ভরসায় লেগে পড়তে চাইছি বল ?·· তাহলে···?"

একটু চুপ করে রইল মণীশ, তার পর একটু হেসে বলল— "তাহলে আর কি ? যা বললুম এক্ষুনি দাদুকে ; লাগুন।"

অরুণার সঙ্গেও কথা হোল ; মণীশেরই।

ও ঘরে গিয়ে একটা বই টেনে নিয়ে পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, অরুণাই এসে তুলল—"ওঠ, কুম্ভকর্ণও যে এ অবস্থায় ঘুমুতে পারত না!"

দুর্যোগের জন্য স্কুলের ছুটি দিয়ে দিয়েছে সকাল সকাল।

মণীশ উঠে পড়তে বলল—"রোস, বইখাতাগুলো রেখে আসি। সব শুনতে হবে বসে, ধরাই যাচ্ছে না তোমায়। এদিকে অবস্থা দেখছ!"

ও চলে গেলে মণীশ বারান্দায় বেরিয়ে এল। দেখল এর মধ্যে কখন এক-পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে, আকাশের অবস্থাও এমন, যে-কোন মুহূর্তে আবার নামলেই হয়। এই সময় ছেলেদের স্কুল থেকেও নরুরা তিন ভাইয়ে হৈ-হৈ করতে করতে বাড়িতে ঢুকল—কোথায় গাছ পড়ে গেছে, কার ঘরের চালা উড়ে গেছে,

কানানদীতে ঘোলাজল নেমেছে, রেলগাড়ির চলাচল নাকি বন্ধ—সত্যে-গুজবে জড়ানো একরাশ খবর। মণীশ দাঁড়িয়ে শুনছিল, অরুণা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—"চল, ও আর কত শুনবে? অদ্য শেষ রজনী, দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। ভেতরে চল।"

ঘরে এসে বসল ওরা, মণীশ বিছানার ওপরই, অরুণা একটা চেয়ারে। মণীশ বলল—"সত্যি, বড্ড বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে না?"

"বললুম তো অদ্য শেষ রজনী।···নাও, আরম্ভ কর শুনে নিই তাড়াতাড়ি। আজ থেকে ঠিক···"

"শেষ রজনীটা কার?"—বাধা দিল মণীশ।

অরুণা একেবারেই দাঁড়িয়ে উঠল গম্ভীর হয়ে, বলল—"চললুম তাহলে মণীশ, না বলতে চাও তো···"

"ব'স ব'স,"—বলে মণীশও খাট থেকে পা নামিয়ে দিল। অরুণা বসলে আবার তুলে নিয়ে বলল—"অমনি রাগ করলে! আমার রাগ হতে নেই ও-ধরনের কথায়?"

"তবু ভালো।"—বলে একটু যেন ব্যঙ্গের হাসি হেসেই অরুণা হাতদুটো কোলে জড়ো করে আবার বেশ সহজ হয়ে বসল, বলল—"নাও, শুরু কর।"

"কি শুনবে?"

"কিচ্ছু নেই শোনবার?" এবার একটু যেন অন্যভাবে রুক্ষ হয়ে উঠল অরুণা।

মণীশ বলল—"এত বেশী যে, কোন্‌টা আগে শুনবে তাই জিজ্ঞেস করছিলুম।···বেশ, আগাগোড়াই বলে যাচ্ছি। কিন্তু কাহিনীটা দীর্ঘ তো, তাই আমার যেটা শোনবার সেটা আগে শুনে নিই, এক কথায় হবে। জিজ্ঞেস করছিলুম—ইয়ে—মালার—মানে, মালার কোথায় বিয়ে দিলে?"

"কেন? সেখানে যাওয়ার জন্যেই এসেছ নাকি?"

ঝড়ের শব্দের জন্য কাছাকাছিই বসেছিল, কথাটা বলেই

অরুণার মুখটা একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। তীব্র অনুশোচনায় ওর ডান হাতখানা ধরে ফেলল; কাতরকণ্ঠে বলল—"আমায় মাফ কর মণীশ; এ কী বলে ফেললুম!"

মণীশ একটু হেসেই বলল—"এর চেয়ে তো ঢের বেশী রূঢ় কথা শোনবার কাজ করেছি আমি রুণাদি।"

কাতর ভাবেই বলল অরুণা—"না না, আমি বলতে চেয়েছিলুম—যদি হত বিয়ে, যেতে সেখানে?...ঠাট্টা করে বলছিলুম মণীশ।"—সামলাতে পারছে না। ধরেই আছে হাতটা।

"হয় নি বিয়ে?"—মণীশ যেন সচকিত হয়ে উঠল।

"বিয়ে!!"—মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল অরুণা।

"হয় নি!...তা হলে?"

"হয়েছে।...তোমার জন্যে বসে থাকবে?"—অনেকটা যেন অন্যমনস্ক হয়ে বলল কথাটা অরুণা। ভেতরে ভেতরে অন্য কি একটা চিন্তা চলছে। মুখটা আবার একটু রুক্ষ হয়ে উঠেছে।

"কোথায়?...তুমি কিন্তু কথা দিয়েছিলে রুণাদি যে..."

"হ্যাঁ, বল, বল। আমি—কথা—দিয়েছিলুম..."

বাকিটুকু ওর রুক্ষদৃষ্টির মধ্যে যেন পূর্ণ হয়ে উঠেছে—"আর কেউ যেন কোন কথা দেয় নি!" মণীশ থতমত খেয়ে আমতা আমতা করে বলল—"না...বলছিলুম—বিয়েটা হোল কোথায়?"

"কাছেই, দু পা গিয়েই—"

সেই রকম রুক্ষভাবে খানিকটা অন্যমনস্ক হয়েই বলে যাচ্ছিল কথাগুলি। হঠাৎ একটু চকিত হয়ে প্রশ্ন করল—"হ্যাঁ—একটা কথা—জিজ্ঞেস করব করব করেও ভুলে যাচ্ছিলুম—কাল সন্ধ্যেয়—যখন তুমি মীরাট থেকে এলে আর কি—কাকে যেন ঘাটে দেখলে—জ্যাঠামশাইকে বলতে বলতে থেমে গেলে—"

মুখের ভাবটা একেবারে বদলে গেছে। রুক্ষতার বদলে একটা তীব্র কৌতূহল—চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সে তো দৃষ্টির ভ্রান্তিই একটা, কি ভাবে বলবে ভাবছে মণীশ, এমন সময়

নীচে ছেলেমেয়েদের কোলাহল উঠল হাওয়ার ওপর ঠেলে—"মেজদাদু এসেছেন! মেজদাদু!…"

অচলনাথ এসেছেন কলকাতা থেকে।

২৯

চেহারা সম্বন্ধে এমনিতেই অগোছাল মানুষ, আরও যেন কি রকম হয়ে গেছে সেটা। চুলগুলো উস্কোখুস্কো, দৃষ্টি খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত, মণীশ আর অরুণা বারান্দার ধারে বেরিয়ে এসেছে, উঠানে দাঁড়িয়েই প্রশ্ন করলেন—"এখানে বৃষ্টি কি খুব বেশী হয়েছে?"

"খুব?…কৈ না তো!"—দুজনেই উত্তর দিল। বিস্মিত হয়ে নামতে যাচ্ছিল, উনিই এগুলেন। বড়বৌ বেরিয়েছে, তার সঙ্গে কি একটা কথা হোল, হাওয়ার শব্দে শোনা গেল না ওপর থেকে। উঠেই এলেন অচলনাথ, নীচের সবাই পেছনে রয়েছে।

অরুণা প্রশ্ন করল—"হঠাৎ চলে এলেন যে?"

"একটা খারাপ খবর শুনলুম—ভাবলুম নিজেই যাই চলে… ভেতরে এস সব।"

ওঁকে অনুসরণ করে সবাই ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। অচলনাথ সবাইয়ের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে এসে বললেন—"এবার দুর্যোগটা একটু বাঁকা গোছের।"

একেবারে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল সবাই, অরুণা যেন কতকটা আবার সহজ হয়ে এসে একটু তিরস্কারের স্বরেই বলল—"না মেজ-জ্যাঠা-মশাই, আমি যা ভাবছিলাম—আপনি রিটায়ার না করা পর্যন্ত এ কটা দিন ছুটি নিয়ে আবার গিয়ে আমায় হোস্টেলে থাকতে হবে। দেখুন তো—পাঁজিতে কোথায় কি লিখেছে তাই শুনে আপনিও…"

"না রে পাগলী। পাঁজির কথা শুনে কি ছুটে আসি?"—সবাইকে কাছে পেয়ে অনেকটা সহজ অচলনাথও হয়ে এসেছেন।

চেয়ারে বসে বললেন—"পাঁজির কথাও নয়, বাজে গুজবও নয়। বর্ধমান জেলায় গলসীতে একটা রিভার রিসার্চ ইনস্‌টিট্যুট (River Research Institute) আছে, দামোদর আর ময়ূরাক্ষী নদী নিয়ে। সেখান থেকে, পাহাড় অঞ্চলে কি রকম জল নামলে নদীর অবস্থা কি রকম যাবে খবর দেয় গবর্ণমেণ্টকে। সেইখান থেকেই আমাদের একজন প্রফেসর নিয়ে এসেছেন খবরটা। তাঁর এক আত্মীয় ওখানে কাজ করেন, গিয়েছিলেন।"

"কি বললেন তিনি ?"—বড়বৌ প্রশ্নটা করল। মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

"আজ সকালের খবর—সকালেই বেরিয়েছেন উনি সেখান থেকে—সে সময় পর্যন্ত খবর ওপর দিকে—বিহার অঞ্চলে জল খুব বেশী—বৃষ্টিও হচ্ছে—যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নীচের দিকে—বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া অঞ্চলে বেশী বৃষ্টি হয় তো খুব খারাপ রকমের বন্যা দেখা দেবে। ওদের রিপোর্টের কথাটা হচ্ছে devastating (বিধ্বংসী)।"

কথাটা বলে অরুণা আর মণীশের দিকে চাইলেন।

মণীশ একবার বাইরের দিকে চেয়ে নিয়ে বলল—"ভাবনার কথা বৈকি ! বৃষ্টি কি আর না হয়ে যায় ?"

"বৃষ্টির কথা কেউ বলতে পারে না যে হবেই"—অরুণা মত দিল। ও-ই বেশ সহজ ভাবটা বজায় রেখেছে, নিশ্চয় চেষ্টা করেই, আতঙ্ক বাড়িয়ে তো ফল নেই। সেই উদ্দেশ্যেই বলল—"আরও একটা কথা মেজ-জ্যাঠামশাই—সকালের খবর ওপর দিকে বিহার অঞ্চলে খুব বৃষ্টি হচ্ছে—পরের খবর তো আমরা জানি না। এমনও তো হতে পারে, থেমে গেছে বৃষ্টি। প্রেসার (pressure) কমে গেছে। নয়তো অমন তোড়ের জল, কিছু না কিছু এসেই পড়ত এতক্ষণ……"

বড়বৌ বলল—"কানা নদীতে ঘোলা জল নেমেছে……"

অরুণা খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল—"আচ্ছা, ওটুকুও হবে

না ? বেচারীর আর আছে কি ? ··আমি বলছিলুম জ্যাঠামশাই, মিছে ভয় করে ফল কি ?···আরও দেখুন—রিভার রিসার্চের ব্যবস্থা একটা উদ্দেশ্য নিয়েই তো—কিছু হলে সরকারের দিক থেকে সবাইকে নোটিশ······"

"শুনলুম খবর এসে গেছে আমতায়; ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব নেই বলে ট্যাটরা পিটুবার ব্যবস্থা হয় নি······" বাধা দিয়ে একটু গম্ভীর হয়েই বলল বড়বৌ।

অরুণা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল,—"তবে তো মিটেই গেল গোল। আগে আসুক ম্যাজিস্ট্রেট, দস্তখৎ করুক কাগজে······"

এবার বিরক্তই হোল বড়বৌ, বেশ একটু ব্যঙ্গের স্বরেই বলল—"তোমার বাহাদুরি আছে ঠাকুরঝি, এত বিপদেও হাসতে পার, আমার তো ভয়ে হাত-পা আসছে না।"

মণীশ এবার কথা কইল। এতক্ষণ একরকম একভাবেই চেয়ে ছিল অরুণার দিকে, চোখে অফুরন্ত বিস্ময় নিয়ে; বলল—"না বৌদি, আমার মনে হয় রুণাদিই ঠিক বলছে—বিপদের মুখে আতঙ্কটা আরও বাড়িয়ে তো কোন ফল নেই, বরং···" ঠাট্টার হাসিটা ততক্ষণ স্পষ্ট হয়ে এসেছে বড়বৌয়ের মুখে; অচলনাথ থাকার জন্য মুখটা একটু ঘুরিয়েও নিয়েছে। অপ্রতিভ হয়ে থেমে গেল মণীশ। অরুণাও সতর্কই হয়ে পড়েছিল, সিপ্রার দিকে চেয়ে বলল—"তুইও আক্কেল হারিয়ে বসে আছিস নাকি ভয়ে ? মেজ-জ্যাঠামশাইয়ের জন্যে চা করবি নে একটু ?···যা, ঘুঁটে দিয়ে উনুনটা জেলে ফেল্ গে।···ভেসে গেলে তুই একলা যাবি নাকি ?"

ওর উদ্দেশ্যটাই সফল হোল, অন্তত তখনকার মতো। তিন জন ছাড়া আর কেউই বুঝল না মাঝখান থেকে কী হয়ে গেল, কিন্তু সবার উদ্বেগটা সেই চড়া পর্দা থেকে আপাতত বেশ একটু নেমে এল। অচলনাথ অরুণার শেষ কথাটা ধরে বললেন—"না মা, কথাটা কি জান ? Hope for the best, but be prepared

for the worst (আশা কর ভালোর, কিন্তু তোয়ের থাকতে হবে মন্দের জন্যই)। তুমি যে বিহারে জল থেমে যাওয়ার কথা বললে —তার একটা সম্ভাবনা যে নেই এমন নয়, একরকম অসময়ের বৃষ্টিই তো এটা। কিন্তু নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকাটাও তো ঠিক নয়……"

এই সূত্র ধরেই আলোচনাটা চলল। ব্যবস্থাও ঠিক হোল। আজ রাত্রে আর কারুর নীচে থাকা নয়। সকাল সকাল রান্না-খাওয়ার পাট সেরে বাসন-কোসন, তৈজসপত্র সব কিছু ওপরে নিয়ে আসা হবে, পালা করে সবাই জেগেও থাকবে সমস্ত রাত।

বড়বৌ, অরুণা, সিপ্রা সবাই নেমে গিয়ে লেগে গেল কাজে; নরুও যেটা পারল করে চলল। কাজের দিকে মন যেতে এদিক থেকে কতকটা নিশ্চিন্তও রয়েছে সবাই, এক এক বার বেশ স্বাভাবিক অবস্থাও এসে পড়ছে। এক সময় আমিষের পাট সেরে শাশুড়ীর জলখাবার তোয়ের করবার জন্য কড়ায় ঘি দিয়ে বড়বৌ খুন্তিহাতে ঘুরে বলল—"না ঠাকুরঝি, যতই ভেবে দেখছি, তুমি ঠিকই বলেছিলে। ত্যাখো না, কাকা যেমন আতঙ্ক নিয়ে এসেছিলেন সেই অবস্থায় সবাই যদি দাদু আর মাকে গিয়ে ভয় পাইয়ে দিতুম তো কী যে অবস্থাটা হত ওঁদের! এ যেটুকু পারা গেল করতে, সুচরং-কুলেই বেশ হয়ে এল।…আসল কথা, তোমরা লেখাপড়া-জানা মেয়ে ঠাকুরঝি, চট করে বেশ ধরে নিতে পার সবটুকু; আমাদের—মুখ্যুসুখ্যু মানুষদের…"

লুচি বেলতে বেলতে অন্যমনস্ক হয়ে শুনছিল অরুণা, হাত থামিয়ে বলল—"বেশ গো ঠাকরুন, তোমার ননদ-কাঁটা ভারি বিদ্বান, ভারি বিচক্ষণ, তুমি এখন তাড়াতাড়ি সেরে নাও দিকিন ব্যাখ্যানা ছেড়ে। আকাশের অবস্থা দেখছ?"

বেড়েই চলেছে। একটানা ঝড়ের গোঙানি, শুধু এক-এক বার তার ওপরেও এক-একটা আওয়াজ তীব্র আর্তিতে উঠছে ফুটে—কে কাকে ডাকছে, হয়তো বা গরু-বাছুর, ছাগলটাকেই। ত্রস্ত

গ্রামটা আপনার যা সব কোলের কাছে টেনে নিয়ে স্থির হয়ে বসতে চায়; যদি মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয় তো তাই।

অকালসন্ধ্যা নামল। আর এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল; অল্প করেই। ছোটদের সবাইকে খাইয়ে-দাইয়ে, ওপরে পাঠিয়ে দেওয়া হোল—সিপ্রা-নরু পর্যন্ত। মণীশ আর অরুণাকেও খেয়ে নিতে বলল বড়বৌ। ষষ্ঠীচরণ আসেন নি, ওরা খেতে চাইল না। নীচের সব পাট সারা হলে ওপরেই হেঁসেল উঠিয়ে নিয়ে গেল বড়বৌ। গুছিয়ে রেখে কোলের ছেলেমেয়ে দুটিকে ঘুম পাড়াবার জন্যে বিছানায় উঠল। মধ্যে কয়েকবারই স্ফুট-অস্ফুট স্বরে বলল—"মানুষটা এখনও এল না!...আক্কেল বটে!...বলিহারি আক্কেলের!..."

কিছুক্ষণ পরের কথা।

অরুণার ঘরটা ভালো করে সাজানো বলে ঐতেই মণীশকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। ভেতরের দিকটা অন্ধকার, দরজার কাছেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিল মণীশ, প্রকৃতির তাণ্ডব দেখছিল, আরও কি ভাবছিল সেই জানে, অরুণা এসে উপস্থিত হোল। বলল—"চল।"

"কোথায়? এ দুর্যোগের মাঝে?"—খুব বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল মণীশ।

"দুর্যোগ আমাদের একলার জন্যে? পাকা, দোতলা বাড়ি রয়েছে..."

বুঝল মণীশ; যেন নূতন করে মনে পড়ে গেল, সেই অরুণাই তো। বলল—"তা দুজনে কেন?"

অরুণার চোখে হঠাৎ জল এসে গেল, ওর একটা হাত ধরে বলল—"আজ আমার সঙ্গে থাকো তুমি মণীশ, শেষ পর্যন্ত। লক্ষ্মীটি, আপত্তি ক'র না।"

"তা বলছিলুম না রুণাদি। আমি বলছি—আমি একাই যাই না; অজানা জায়গা তো নয়। ঘুরে ফিরে কথাটা সবার মধ্যে

চারিয়ে দিয়ে সাবধান করে দেওয়া তো? তুমি আর যাও কেন এ অবস্থায়?"

"শুধু সাবধান করে দিলেই হবে? যতটা সম্ভব ব্যবস্থা করা যেতে পারে ··আর, দাদা এল না কেন এখনও মণীশ?—ঝড় বাড়ছে, গাছ ভেঙে পড়ছে চারিদিকে·· "

হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ওর হাতের ওপর কপালটা চেপে হু-হু করে কেঁদে উঠল। খানিকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না মণীশ।···সেই অরুণা, এগারো বৎসরে কত ভুলে গেছে তাকে। বড়বৌ তবু বার কয়েক মুখ ফুটে অনুযোগ করল বেয়াক্কেলে বলে; ও একটি বারও কিছু বলে নি; ঐ দুশ্চিন্তা বুকে চেপে কাজ করে গেছে, হালকা বিদ্রূপ করেছে, হেসেছে পর্যন্ত।

গভীর সমবেদনায় মাথায় হাতটা চেপে ধরল মণীশ, যতটা পারল কণ্ঠস্বরে ভরসা এনে বলল—"চুপ করো রুণাদি, তুমিও এ রকম হেদিয়ে পড়লে এদের হবে কি! আর ভেবে ছাখো, বড়দার কিছু একটা বিপদ হলে—সামান্য কিছুও—খবর দিয়ে যাওয়ার লোক নেই কি গ্রামে?···ওঠ, চুপ করো, বড্ড বাড়িয়ে দেখছ ব্যাপারটাকে।"

অরুণা উঠে দাঁড়িয়ে একটা কপাট চেপে মুখটা একটু ঘুরিয়ে দাঁড়াল। একটু চুপ করেই রইল, গলাটা সহজ করে নিতে যেটুকু দেরি হোল, তার পর বলল—"আর ছাখো না, তুমিও কোথা থেকে এই বিপদের মধ্যে এসে পড়লে এতদিন বাদ দিয়ে!"

"আমি তো বলি—ভাগ্যিস পড়লুম এসে···"

"ভাগ্যিস আর নয়!"—চোখ তুলল, দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন কোন্ দূর স্মৃতির ওপর গিয়ে পড়েছে। মণীশের মনে হোল মালার কথা বুঝি এসে পড়বে আবার। ঐ স্মৃতিই সব, তবু অরুণার কাছে কেমন যেন ভয় করছে। বলল—"তাহলে চল যাই; স্কুলের দিকেই আসি।··বলে যাচ্ছ কাউকে তো?"

"দাদু-জ্যাঠাইমাকে তো বলা চলবে না। বড়বৌদি জানে ননদ বাউণ্ডুলে।" একটু হাসল।

যতটুকু হালকা হয়, ভালোই। মণীশও একটু হেসে বলল—"তার ওপর আর এক বাউণ্ডুলে এসে জুটেছে, কি বল ?"

হাওয়ার মতো এদিককারও সব আজ যেন এলোমেলো; অরুণার এক-একটা রূপ খুলে দিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওরা নীচে নেমেছে, ষষ্ঠীচরণ এসে উপস্থিত হলেন। ওঁরা স্কুলের শিক্ষক আর ছাত্র মিলে এই কাজই করছিলেন। দুটো স্কুলের দুটো বাড়িতে সবার থাকবার ব্যবস্থা করে, চারিদিকে কথাটা চারিয়ে দিয়ে এসেছেন। যাদের ঘর উঁচু ডাঙায়, তাদের ওখানে গিয়েও থাকবে সবাই। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে আসতে বলে দেওয়া হয়েছে সবাইকে। কিছু কিছু এসেও পড়েছে ওঁদের থাকতে থাকতেই। ভলন্টিয়াররা কাজ করছে। জোর খাটাতে হচ্ছে জায়গায় জায়গায়।

"তার মানে ?"—মণীশ প্রশ্ন করল।

"অনেকের আবার ধারণা তো, নাও আসতে পারে—দেশের লোকের যা রোগ, complacency (ভুল আত্মবিশ্বাস)। কিন্তু সন্দেহ বা complacency-র তো অবসর নেই আর।"

একটু যেন ভেবে নিলেন পরের কথাটা বলবেন কি না, তারপর দুজনের উৎসুক মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—"তারে একটা মেসেজ যাচ্ছিল, পোস্টমাস্টার হরনাথবাবু ধরেছিলেন— হঠাৎ কানে লাগায়; বন্যাটা বর্ধমানের ওদিক পর্যন্ত এসে গেছে।"

কত রাত হয়েছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ঘরে ঘড়ি নেই, ওর নিজের হাতঘড়িটাতে দম দেওয়া হয় নি আজ। খাওয়া-দাওয়ার পর ক্লান্তি-অবসাদে এক ঝোঁক খানিকটা ঘুমিয়েছিল। হাওয়ার দাপটেই সেটা এক সময় ভেঙে যায়. তার পর আর আসে নি ঘুম। চেয়ারে এসে বসেছে, আবার বিছানায় গিয়ে শুয়েছে, ভাবনায় ভরা মনটা, যদিও ভাবনার কোন বাঁধুনি নেই; কখনও অরুণা, কখনও মালা, কখনও কাশী, কখনও লক্ষ্ণৌ কি মীরাট।

কয়েকবার দরজা খুলে বারান্দাতেও এসে দাঁড়াল। দিনের বেলায় ছুর্যোগের সঙ্গে আরও সবাই ছিল। এখন মুখোমুখি হয়ে শুধুই ও আর এই ছুর্যোগ। সেই জন্যেই বোধ হয় মনে হচ্ছে অনেকগুণ বেড়ে গেছে। শুধু তাই নয়, রাত্রিটা শুধু রাত্রি বলে মনে হচ্ছে না, যেন একটা ভ্রূকুটিময়ী তামসী সত্তা, এ ছুর্যোগ তার তিরস্কার।

"তুমি মালার সর্বনাশ করেছ।"

—নিজের মুখ থেকে নিজের কথাটা বেরিয়ে এসে ঝড়ের শব্দে মিশে গেছে। বুঝল, কিন্তু এমন একটা অন্ধ প্রত্যয়ের দিকে চলেছে মনটা যে যেন আয়ত্তের মধ্যে আনা যাচ্ছে না;—ঠিক যেন কাল সন্ধ্যায় সব জেনেও ভেবেছিল ওটা শিশির-ভেজা গুল্ম নয়, মালাই। এবার সতর্ক থাকায় আর মুখ ফুটে বেরিয়ে পড়ল না কথাটা, তবে মনের মধ্যে সেজে দাঁড়াল—"আমি ওর কলঙ্ক থেকে ওকে তুলে নোব—নোব—নোব···আমি যে তাই এসেছি এতদূর থেকে··"

—একটা অসহ্য অবস্থার মধ্যে পড়েছে। সঙ্গ দরকার মানুষের। ডেকে নেবে না হয় ষষ্ঠীচরণকে কোন একটু ছুতো করে?

ঠিক এই সময় পর পর ছুটো এমন ব্যাপার হয়ে গেল যে, সঙ্গে

সঙ্গেই কারণটা অবগত হয়ে গেলেও মনের রাশ আর যেন পারলই না টেনে রাখতে মণীশ। বাইরে গিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নেওয়ার জন্যেই চেয়ার থেকে উঠতে যাবে, হঠাৎ একটা তীব্র কান্না, সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন দু হাত দিয়ে বাইরের দিকের জানলার পাল্লা দুটো ঠেলে ভেতরে পড়ল ঢুকে।

তখনই টের পাওয়া গেল, কেউ বা কিছু নয়। যে কাঠের ছিটকিনিটা দিয়ে জানলাটা বন্ধ করা ছিল, হাওয়ার চাপে আস্তে আস্তে আলগা হয়ে পেরেকসুদ্ধ খুলে হঠাৎ ছিটকে পড়েছে। কান্নাটা ছিল ফাঁকের মুখে হাওয়ার চাপ।

চেয়ারের কাছেই এসে পড়েছে। তুলে নিয়ে আবার ভালো করে ঠুকে দেওয়ার জন্যে একটা কিছু খুঁজল ঘরের চারিদিকে চেয়ে। না দেখতে পেয়ে টেবিলের দেরাজটায় টান দিল—যদি কিছু পেয়ে যায়।

প্রথমেই যা চোখে পড়ল তাতে ওর সমস্ত শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। মালার নাম লেখা একটা খাতা। বের করে টেবিলে রাখল মণীশ, হাতটা কেঁপে যাচ্ছে।

খুলল গোড়ার দিকটায়। ওর প্রবন্ধের খাতা, মণীশের হাতের লেখা শোধরানো। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মণীশ।···সব মুছে গেছে—রাত্রি, ঝড়, মাঝের এগারো বৎসরের সব কিছু, যেমন সেসব দিনে আর সব কিছুই যেত মুছে—শুধু টেবিলের পাশাপাশি খাতা দেখা নিয়ে বসে আছে ও আর মালা। এই সময় ঝড়ের একটা দমকে পাতাগুলা ফরফরিয়ে গেল উলটে। আর একটা তীব্রতর বিদ্যুৎপ্রবাহ সারা দেহে।···অরুণার হাতের লেখা। এক জায়গায় হাতটা চেপে পড়তে গিয়ে ছাখে অরুণার ডায়েরী।

কারুর ডায়েরী পড়া কি ঠিক হয়?

নীতিজ্ঞানটা রয়েছে কিন্তু সংযম হারিয়েছে মনের। চিন্তা করতে করতেই দৃষ্টিটা কয়েকটা লাইনের ওপর দিয়ে পিছলে গেল। ঠিক ডায়েরী নয়; মনে হচ্ছে মণীশ যাওয়ার পর থেকে মালার

গতিবিধি-পরিবর্তন সম্বন্ধে খানিকটা খানিকটা করে যেন নোট্ রেখে গেছে অরুণা। এক এক জায়গায় ওর নিজের মন্তব্যও আছে; হয়তো একটা উপন্যাসেরই প্রস্তুতি, লেখার অভ্যাসটা তো আছেই। মালাকে নিয়ে, তাই মালার খাতা বেছে নিয়েছে; এটুকু সেন্টিমেন্ট বা ভাবাবেশ।

তীব্র কৌতূহলে মণীশের সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে; সবটার ঠিক যেন অর্থও ধরতে পারছে না। ঘুরে-ফিরে, আগে-পেছনে, মাঝখানে পাতা ওলটাচ্ছে—চোখ দিয়ে যেন বিঁধছে অক্ষরগুলোকে। ও খুঁজছে মালার পরিণতি—কী হোল তার—কোথায় হল বিবাহ?—কিংবা সেই কঙ্কলিপ্ত আরও কিছু যেটাকে ব্যঙ্গের স্বরে 'বিবাহ' আখ্যা দিল অরুণা।

এক-এক জায়গায় দৃষ্টি আটকে আটকে যাচ্ছে—এই বুঝি পাওয়া গেল সন্ধান। একটা তারিখের নীচে লিখে রেখেছে—"আজও মালা নাকি এসেছিল—এপারে নয়, ওপারের ঘাটটায়—বৌদিও দেখেছিলেন বললেন। আমার বিশ্বাস হয় না, তবুও কেমন যেন ভাবতে ভালো লাগে, চলে আসে মালা। লাগবে না ভাবতে ভালো যে আমাদের বাঁধনটাই বড়, আমাদেরটাই শাশ্বত! বেশ স্বচ্ছ চোখে আমরা সব জিনিস দেখতে পাই না কেন? ও যা করে বসল সেটা তো ক্ষণিকের ভ্রান্তি, সেইটাই চিরন্তন হয়ে থাকবে বড় ওর জীবনের ইতিহাসে? আমি এই ভাবে নিচ্ছি এটাকে—ওর এটা ছিল বলতে গেলে একটা অভিসারই তো (কাব্যের ভাষাই নিলাম), সব অভিসারের সামনে থাকে প্রবল আকর্ষণ পেছনে থাকে বিভ্রম; ওরও তাই ছিল। কিন্তু বুঝবে কে সে কথা? এখন ও যে আসে (যদি সত্যি হয়)—ওর যে এই উল্টো অভিসার, যাকে সত্যিই ভালবেসেছিল তার জন্যে······"

জানলাটা বন্ধ করা হয় নি। আঙুল আলগা হয়ে হাওয়ার একটা ঝাপটায় আবার ফরফরিয়ে উড়িয়ে দিল পাতাগুলো। চেপে ধরল মণীশ, একেবারে শেষের দিকে। খাতার শেষ নয়, লেখার

শেষ। আজকেরই তারিখ। মনে পড়ল ওরা যখন খেতে বলল, অরুণা ছিল না, লেখাটা একটু তাড়াহুড়োর মধ্যে যেন—

"কি ভাবল মণীশ—যখন বললুম বিয়ের কথা—কাছেই বিয়ের কথা! না, ভুলটা ভেঙে দিতে হবে—এত বড় ব্যাপার নিয়ে পরিহাস নয়—ভেবে দেখছি তার চেয়ে সত্যি কথাটা ঢের সহজ—নয়তো কতই না ফিকরি বেরুতে পারে। দেখছি ভুল হয়েছিল মালার কথাটা ওকে বলতে সবাইকে মানা করে—সহজভাবে কারুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলেই ছিল ভালো। আঘাত?—তা ওর পাওয়া উচিত ছিল—প্রাপ্য ওর"

লেখাটার পূর্ণচ্ছেদ নেই। তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হয়েছিল অরুণাকে। মনে পড়ছে খেয়ে এঘরে আসবার সময় অরুণাকে বারান্দাতেই দেখেছিল মণীশ—বোধ হয় জিজ্ঞেসও করেছিল—এ রকম ঝড়ে বাইরে কেন—কি উত্তর পেয়েছিল মনে পড়ছে না।

কি যে হয়ে গেল, আর খাতাটা দেখবার ইচ্ছা নেই একেবারেই। সব তো পেয়েই গেল—মালা গেছে চলে ক্ষণিকের ভ্রান্তিতে।··· আসে—কিন্তু আসে বড় সন্তর্পণে, যেন শুধু রাত্রেই। কোথায় থাকে লুকিয়ে, তার পর ঘাট যখন একেবারে নিরিবিলি, বেরিয়ে এসে দাঁড়ায় ··অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে থাকে এই বাড়িটার দিকে···

দেরাজের মধ্যে খাতাটা রেখে দিতে দিতে হঠাৎ যেন টনক নড়ে উঠল মণীশের—আজকের চেয়ে নিরিবিলি রাত আর কবে পাবে মালা? নিশ্চয় এসেছে; নিশ্চয়। ঝড়-বাদলের মধ্যে ঘাটের রানায় দাঁড়িয়ে—হয়তো আজ আরও কাছেই—একেবারেই কাছে—চেয়ে আছে বাড়িটার দিকে।···ঠিক, মণীশ যে এসেছে এটাও তো তার জেনে ফেলবার কথা!···এ দুর্যোগে?—কিন্তু ওর মনের যা দুর্যোগ তার কাছে এ যে কত তুচ্ছ!

যাবে মণীশ।

চেয়ার ঠেলে উঠেছে, দরজায় খটখট খটখট করে একসঙ্গে অনেকগুলো দ্রুত ঘা পড়ল।

"মালা !!"—চিৎকারটায় হঠাৎ যেন কণ্ঠরোধ করে মণীশ একরকম ঝাঁপিয়ে পড়েই হুড়কোটা টেনে কপাটটা খুলে ফেলল।

৩১

মালা নয়, অরুণা।

মণীশ যদি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ থাকত, টের পেত অরুণা ক্ষণিকের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে। তাই করেছে। এ রকম চেহারা কেন, মালা বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল কেন—এসবের দিক দিয়েও না গিয়ে শুধু প্রশ্ন করল—"তুমি ঘুমোও নি মণীশ ?"

কণ্ঠস্বর শান্ত, আর, এত সুন্দরও দেখে নি ওকে এসে পর্যন্ত। যা কিছু খুঁৎখাঁৎ এসে পড়েছে চেহারার মধ্যে এই কটা বৎসরে, কী জাদুবলে সব যেন শুধরে নিয়ে মোহিনী মূর্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। শুধু তাইতেই মণীশকেও যেন অনেকটা প্রকৃতিস্থ করে আনল। একবার পেছনে দেখে নিয়ে বলল—একটু স্খলিত স্বরেই বলল অবশ্য—"ঘুমুচ্ছিলুম ··হঠাৎ জানলাটা খুলে গিয়ে ·····হাওয়ায় ছিট্‌কিনিটা উপড়ে যাওয়ায়······"

"ও !" একটু হাসল অরুণা, বলল—"চলো ভেতরে।"

দোরটা বন্ধ করে দিয়ে বলল—"আমি মনে করলুম···তোমারও আমারই মতন অবস্থা বুঝি···ইয়ে, কোথায় ছিটকিনিটা ?"

টেবিলের ওপরই ছিল, মণীশ তুলে নিয়ে বলল—"এই যে। ঠুকে দেওয়ার জন্যে কিছু একটা খুঁজছিলাম।"

"দাও আমায়।"—বলে ওটা হাতে নিল অরুণা।···দেরাজটা টেনে, হঠাৎ ঘাড়টা ফিরিয়ে প্রশ্ন করল—"তুমি আমার দেরাজ ঘাঁটাঘাঁটি করো নি তো ?"

"তা কেন করতে যাব ?"—মিথ্যাই বলল মণীশ। একটু বরং জোরও দিল ; বলল—"চোর নয় তো।"

দেরাজের ভেতরটা হাতড়াতে হাতড়াতে অরুণা বলল—"চোর তো একরকমই হয় না।"—একটু ঘুরে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একটু হাসল।

একটা লোহার পেপারওয়েট্ বের করে নিল। ওর কথার মানেটা ধরবার চেষ্টা করে, ছেড়ে দিয়েই বলল মণীশ—"বুঝলুম না তোমার মানে···দাও আমিই ঠুকে দিচ্ছি।"

"থাক্।"

"বেটাছেলেরই কাজ তো ওটা।"

"বেটাছেলে বরং বোঝবার চেষ্টা করুক মানেটা ততক্ষণ।"—আবার ঘুরে মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে একটু হাসল।

ঠোকা হয়ে গেলে জানলাটা বন্ধ করে ফেলার পর একটা যেন অনুচ্ছেদ শেষ হয়ে যেতে মণীশ গোড়ার প্রশ্নটা এনে ফেলল এতক্ষণে —"কিন্তু তুমি হঠাৎ এত রাত্রে রুণাদি? আর তখন যে জিগ্যেস করলে তোমারই মতন অবস্থা নাকি আমার—তার মানেটা···"

"বাবাঃ, এত মানে বোঝাতে হবে জানলে···"—বাতাসের গর্জনের গায়ে খিলখিল তরল হাসির একটা সরু মীড় টেনে দিয়ে অরুণা বলল—"ভুল হয়ে গেছল; এখন দেখছি মোটেই আমার মতন নয় অবস্থা।·· তবে আশা করছিলুম অন্তত আমারটা বুঝবে ···থাক্।"

মুখের দিকে চেয়েই আছে মণীশ। এতদিনের সঙ্গ, এমনটি তো কখনও দেখে নি অরুণাকে—এত লাস্যময়ী, এত রহস্যময়ী।

একটু যেন সময় দিয়ে—কিংবা নিজেরই বাকি সঙ্কোচটুকু টেনে ফেলতে যতটুকু সময় লাগল, তারপর অরুণা বলল—"বোষ্টম পরিবারেরই মেয়ে তো গো, এ রকম দুর্যোগে—পদাবলির ভাষায় বলতে গেলে এ রকম দুর্যোগের সুযোগে কি নিজের ঘরের কপাট এঁটে···ত্যাখো, এখনও বোকার মতন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে!"

আবার সেই মীড়ের টান। মণীশ বলল—"অভিসার বলছ? ···কিন্তু এ দারুণ দুর্যোগে অভিসার, সে তো মৃত্যু রুণাদি!"

"এক ঘর থেকে অন্য ঘরে গেলেও···"

কথাটা হঠাৎ এইখানেই থামিয়ে দিল। ওর দৃষ্টিটা যেন অবাধ্য ভাবেই একবার দেরাজটায় গিয়ে পড়ল। মুখটা খোলা ছিল, ভালো করে ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে মণীশের দিকে ফিরে চাইল। মনে হয় যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এতক্ষণ এত রকম, সেটা যেন অনেকখানি সফল হয়েছে। সেই উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা আর নেই মণীশের মুখে। কিন্তু এও তো বুঝছে আগুন নিয়ে এ খেলা, আর বাড়াতে গেলেই সর্বনাশ ; তাই ওদিকে মুখে-চোখে তার লক্ষণ ভালো করে ফুটে ওঠার আগেই ভাব ভঙ্গি সব হঠাৎ বদলে ফেলে, নিজের কথা ছেড়ে, ওর কথাটা ধরেই বলল—"হ্যাঁ, সেই অভিসারেই বেরিয়েছি মণীশ। একবার যেতেই হবে বাইরে, চলো একবার দেখে আসি।"

দারুণ আগ্রহে ওর একটা হাত চেপে ধরল। এবার যেন মণীশেরই সামলাবার পালা, বলল—"কিন্তু রুণাদি, বড়দা তো সব ঠিকঠাক করেই এসেছেন।"

"না মণীশ। মনটা বড্ড আইঢাই করছে। আমার যেন কিছু করা হোল না এত বড় একটা দুর্বিপাকে। একবার শুধু দেখে আসি ঠিক আছে কিনা সব।"

কি ভেবে একবার ওর মুখের দিকে চকিতে চেয়ে নিয়ে বলল—"বেশ তো, আবার এসে তোমার ঘরেই বসা যাবে।"

আর আপত্তি করতে পারল না মণীশ। ঘরের শেকলটা তুলে দিয়ে ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল।

এই একটুখানি সময় ওরা কোন্ লোকে ছিল, একেবারেই টের পায় নি, বেরিয়ে দেখল প্রবল ধারায় বৃষ্টি নেমেছে কখন। সেই সঙ্গে, এতক্ষণ শুধু হাওয়ার গর্জনই ছিল—এবার আকাশের গর্জন আর বিদ্যুচ্ছটা। এতক্ষণ যেন একা শিবেরই তাণ্ডবলীলা চলছিল, এবার সাঙ্গপাঙ্গরা এসে মত্ত উল্লাসে দিল যোগ।

অরুণা তীব্র অনুতাপের স্বরে বলল—"বড্ড দেরি হয়ে গেল ! কী হচ্ছে—কী হবে তাদের!···এমনটা তো কখনও দেখি নি মণীশ।"

বাজ পড়ল কোথায়। আকাশ চিরে বিদ্যুতের ঝলক। পুকুরের চারিধারে নারকেল-সুপারি গাছগুলো প্রেতের মতোই উঠছে মেতে —জটায় জটায় জড়াজড়ি হয়ে যাচ্ছে। ছিন্ন জটা নিয়ে শূন্যে চলেছে লোফালুফি।

দুজনেই সম্মোহিত হয়ে গেছে। আরও বেশী করে যেন অরুণাই। সে যেন ঝড়-বৃষ্টি-অন্ধকার ঠেলে কী একটা সন্ধান করছিল, একটা বিদ্যুৎ খেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মণীশের হাতটা চেপে ধরে বলে উঠল—"মণীশ, গ্যাখো !! দেখেছ ?"

"কি, কি রুণাদি ?"—সামনেই চেয়ে ছিল, তীব্র প্রত্যাশায় ওর অন্ধকার-লিপ্ত মুখের দিকে ঘুরে চাইল মণীশ। অরুণা নির্বাক প্রতীক্ষায় সেইভাবেই চেয়ে আছে সামনে, আর একটা বিদ্যুতের আশায়। খেলে যাওয়ার সঙ্গে হাতটা শিথিল করে দিয়ে বলল— "না, কিছু নয়—"

বুকের হাওয়াটা নামিয়ে দিয়ে বলল—"এমন দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায় এসব রাতে !"

দৃষ্টি সহজ করে নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে আরম্ভ করেছিল— "মনে হোল যেন কে···" সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র উদ্বেগে প্রশ্ন করে উঠল —"ও কি মণীশ, তোমার চেহারা !"

উলটে গেছে সব। মণীশই এবার ওর হাতটা চেপে ধরল— বেশ কড়া করেই বলল—"মুকুচ্ছ রুণাদি, তুমি দেখেছ ! হ্যাঁ, ঠিক দেখেছ তুমি।"

"কাকে !—দেখব কাকে ?"

"দেখেছ মালাকে : মুকুচ্ছ। সে···"

"সে আজ সাত বছর হোল···"

"জানি সব আমি—অভিসার—তারপর বিয়ে—কলঙ্ক মাথায় নিয়ে—তারপর হয়তো···কিন্তু আমি তাকে তার কলঙ্ক সুদ্ধ তুলে নোব—তাই এসেছি আমি রুণাদি—এই এগারো বছর পরে···"

কতটা শুনছিল অরুণা বলা যায় না—তবে একটা প্রবল চিন্তা-

স্রোত চলেছে।...সংযম হারিয়েছে আবার মণীশ, আরও ভীষণ ভাবেই; এবার কী অভিনয়ে আত্মস্থ করে ওকে? আর তো মোহিনী-মূর্তিতে হবে না।

বেশ রুক্ষদৃষ্টিতে তিরস্কারের স্বরেই বলল অরুণা—"তুমি আমার ডায়েরী দেখেছ মণীশ তাহলে দেখছি। কেন দেখতে গেলে?"

পরিবর্তন নেই কোন। সেই রকম একটা জিদ—

"হ্যাঁ, দেখেছি। সেটা কিন্তু তত বড় কথা নয়।...লিখেছ সে আসে—তুমি বিশ্বাস কর না লিখেছ, আমি কিন্তু করি—কী দেখলে বল রুণাদি—কোথায়, এপারে, না ওপারে?"

—হাতে একটা ঝাঁকানিই দিল এবার। উৎকণ্ঠায় চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। অরুণা একটু ভাবল, এ পর্যন্ত যেটা বলে নি, চরম কথাটা, সেটা বলবে কি বলবে না, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল—"শোন মণীশ। অভিসার বলেছি মরণ-অভিসার বলে।.. মালা মরেছে—আত্মহত্যা করেছে—ডুবে।"

একেবারে স্তব্ধতা। ওদের কাছে আকাশ-বাতাসও যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

"মরেছে! ডুবে।—কোথায় রণাদি?"

"এই পুকুরে। এই ঘাটে। এই রকম এক রাত্তিরে।"

পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে আছে। মণীশের ভাবলেশহীন দৃষ্টির মধ্যে কি একটা যেন দেখতে পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে অরুণা। কি করবে, যেন অসহায় বোধ হচ্ছে। ধীরে ধীরে ফুটে উঠল সেই জিনিস ওর দৃষ্টিতে। একটা অন্য কোন্ লোকে যেন জেগে উঠল হঠাৎ মণীশ। স্তব্ধ থেকে একেবারে চঞ্চল—

"তাহলে আমি ঠিক দেখেছি রুণাদি—দেখেছি কাল।...তুমি বিশ্বাস কর না, আমি করি।...না, তুমিও তো কর। লিখেছ উলট অভিসার—এই বাড়ির মায়ায়। না, না, তুমি এখনি দেখেছিলে—লুকুচ্ছ।..."

হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল। এই যে ঝঞ্ঝা—এই যে বিচিত্র শব্দের

মিশ্র কলরোল, এর মধ্যে থেকে একটাকে যেন চিনে নিয়ে চিৎকার করে উঠল—"মালা!! ভুলি নি আমি—আসছি!!—এই—এলুম!!"···

হাতটা ছেড়ে, অরুণা ধরে ফেলবার আগেই, বিদ্যুৎগতিতে যেন ছিটকে পড়ল—সিঁড়ি, উঠান—তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল।

একটুখানি হারিয়েই ছিল সম্বিত অরুণা—তারপর ডাকতে ডাকতে ছুটল। বাইরে গিয়ে দেখল বাড়ির দেয়ালের চারিদিক দিয়ে প্রপাতের মতো বন্যার জল নেমেছে পুকুরে কখন্, পুকুর নেইই আর, ভেসে গেছে।

সবাই উঠে বারান্দায় জমা হয়েছে। ললিতমোহনকে তোলা হয় নি। অচলনাথ আর ষষ্ঠীচরণ বৃথা অসম্ভব অন্বেষণ শেষ করে উঠে এলেন। বাড়ির দুদিককার দেয়াল ভেঙে পড়ল আর্তনাদ করে!···একটা গাছ ভেঙে পড়ার টানা কর্কশ শব্দ।···সবার দৃষ্টি অপলক, অন্ধকার ভেদ করে, বিদ্যুতের চোখ-ধাঁধানো দীপ্তি কাটিয়ে অনুসন্ধান করছে।

উত্তরদিকে দূরে কোথায় শাঁখের আওয়াজ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়টা, এদিকে ওদিকে। ষষ্ঠীচরণ একবার ঘাড়টা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—বাঁধ ভেঙেছে।"

শব্দগুলা বোধহয় কানে যায় নি অরুণার। প্রশ্ন করল—"কি বললে বড়দা?"

"বাঁধটা ভেঙেছে নিশ্চয়। তারই অশুভ ঘোষণা, শাঁখ বাজিয়ে।"

অরুণা আরও অন্যমনস্ক হয়ে গেছে যেন। ভাবছে—কিন্তু শুভ-অশুভের প্রভেদ-রেখা কে নির্ণয় করবে?

"ও! শাঁখ?"—বলে একসময় হঠাৎ ঘোরটা থেকে জেগে উঠল। পাশে সিপ্রা ছিল দাঁড়িয়ে, একটু যেন ব্যস্ত হয়েই বলল—"আমাদেরটাও আন্ তো ভাই, বাজিয়ে দিই!"

সমাপ্ত